

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প

সফলতার গল্প



প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প
সফলতার গল্প



প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প

সফলতার গল্প

পরিকল্পনা, গ্রহণ ও সম্পাদনা
আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
ড. মোঃ মোস্তফা কামাল, প্রকল্প পরিচালক, এলডিডিপি

সহযোগিতায়

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, চীফ টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেটর, এলডিডিপি
ইঞ্জিনিয়ার পার্থ প্রদীপ সরকার, উপপ্রকল্প পরিচালক, এলডিডিপি

ড. হিরন্ময় বিশ্বাস, উপপ্রকল্প পরিচালক, এলডিডিপি

ড. মো. শাকিফ-উল-আযম, উপপ্রকল্প পরিচালক, এলডিডিপি

ড. মোহম্মদ হারুন-অর-রশিদ, উপপ্রকল্প পরিচালক, এলডিডিপি

এস.এম. সামিউল আউয়াল, উপপ্রকল্প পরিচালক, এলডিডিপি

খোঃ জাহির হোসেন, সিনিয়র মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন স্পেশালিস্ট, এলডিডিপি

সরকার মোহাম্মদ খায়রুল আলম, সিনিয়র ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট, এলডিডিপি

ড. শামীম আরা শামী, জেন্ডার স্পেশালিস্ট, এলডিডিপি

সোনিয়া মাওলা, জুনিয়র ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট, এলডিডিপি

শেখ শাহ নেওয়াজ, মনিটরিং অফিসার, এলডিডিপি

এসএনএম মনিরুজ্জামান, মনিটরিং অফিসার, এলডিডিপি

প্রকাশনায়

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল

মার্চ ১৫, ২০২৬ খ্রি.

মুদ্রণে

কলেজগেট বাইন্ডিং এন্ড প্রিন্টিং

১/৭, কলেজগেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।, ফোন : ০১৭১১৩১১৩৬৬

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের অর্থনীতি ও মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে কৃষি ও খামার ব্যবস্থার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। গ্রামবাংলার অসংখ্য মানুষ নিজেদের পরিশ্রম, ধৈর্য এবং সৃজনশীলতার মাধ্যমে খামার পরিচালনা করে শুধু নিজেদের জীবনই বদলাচ্ছেন না, বরং দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

বর্তমানে জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ প্রত্যক্ষ এবং প্রায় ৫০ শতাংশ পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদের উপর নির্ভরশীল। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ সেক্টরের টেকসই উন্নয়ন, তৃণমূল পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ খাতে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি, প্রাণিজ আমিষ, দুধ, ডিম ও মাংসের চাহিদা পূরণ হবে। আর প্রাণিসম্পদ খাতের এই আমূল পরিবর্তনে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমানে তৃণমূল খামারি, উদ্যোক্তা এবং স্টেকহোল্ডারগণ প্রাণিসম্পদ সেক্টর থেকে পরামর্শ ও বিভিন্ন ধরনের বিষয়ভিত্তিক সেবা গ্রহণ করেছে। প্রাণিজ আমিষের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সচেষ্ট রয়েছে।

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প এর “সফলতার গল্প” বইটি সেই সব সংগ্রামী ও অনুপ্রেরণাদায়ী মানুষের বাস্তব জীবনের গল্প নিয়ে সাজানো হয়েছে, যারা সীমিত সম্পদ, নানা প্রতিকূলতা এবং চ্যালেঞ্জের মধ্যেও খামার ব্যবস্থাপনায় অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন। তাদের অভিজ্ঞতা, পরিশ্রম, পরিকল্পনা এবং উদ্ভাবনী চিন্তাধারা নতুন খামারিদের জন্য এক মূল্যবান দিকনির্দেশনা হয়ে উঠতে পারে।

এই বইয়ের প্রতিটি গল্প শুধু সাফল্যের কাহিনি নয়; এর মধ্যে রয়েছে ব্যর্থতা থেকে শেখা শিক্ষা, ধৈর্যের পরীক্ষা এবং নতুনভাবে এগিয়ে যাওয়ার সাহস। যারা খামার শুরু করতে চান বা ইতিমধ্যে খামার পরিচালনা করছেন, তাদের জন্য এই অভিজ্ঞতাগুলো অনুপ্রেরণা ও বাস্তব শিক্ষা হিসেবে কাজ করবে।

আমাদের বিশ্বাস, এই বই পাঠকের মনে আত্মবিশ্বাস জাগাবে, নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করতে সাহায্য করবে এবং কৃষি ও খামার খাতে আধুনিক ও লাভজনক উদ্যোগ গ্রহণে মানুষকে উৎসাহিত করবে।

পরিশেষে, এই বই প্রকাশে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন এবং যেসব খামারির জীবনগল্প এখানে স্থান পেয়েছে—তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আশা করি, পাঠকবৃন্দ বইটি থেকে অনুপ্রেরণা ও বাস্তব জ্ঞান লাভ করবেন।

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

সংক্ষেপণ

সিডিআইএল (CDIL): সেন্ট্রাল ডিজিজ ইনভেস্টিগেশন ল্যাবরেটরি

ডিডিবি (DDB): ডেইরি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড

ডিএলএস (DLS): ডিপার্টমেন্ট অফ লাইভস্টক সার্ভিস

এফএও (FAO): ফুড এন্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন

এফডিআইএল (FDIL): ফিল্ড ডিজিজ ইনভেস্টিগেশন ল্যাবরেটরি

এফএমডি (FMD): ফুট এন্ড মাউথ ডিজিজ

আইএসও (ISO): ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর স্ট্যান্ডারাইজেশন

এলডিডিপি (LDDP): লাইভস্টক এন্ড ডেইরি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট

এলইও (LEO): লাইভস্টক এক্সটেনশন অফিসার

এলএফএ (LFA): লাইভস্টক ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট

এলএফএসএস (LFSS): লাইভস্টক ফার্মারস ফিল্ড স্কুল

এলএসপি (LSP): লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার

এলএসডি (LSD): ল্যাম্পি স্কিন ডিজিজ

এমভিসি (MVC): মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক

পিপিপি (PPP): পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ

পিজি (PG): প্রডিউসার গ্রুপ

সূচিপত্র

ক্রঃ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা
১	প্রাণিসম্পদের টেকসই উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প	০১
২	জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান	০৩
৩	জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ-২০২৫ প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি	০৭
৪	নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের জন্য মানসম্মত কসাইখানা	১৩
৫	মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক সক্ষমতা উন্নয়নের রূপান্তরমূলক উদ্যোগ	১৬
৬	হাতের স্পর্শ ছাড়াই আধুনিক মেশিনে স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ মিষ্টি তৈরি	২১
৭	গরুর খামারের বর্জ্য থেকে গ্যাস ও বিদ্যুৎ	২৪
৮	নিরাপদ খাদ্য হিসাবে দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্য উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড	২৬
৯	দুধ উৎপাদনকারীদের সমবায় শক্তি টেকসই অর্থনৈতিক একটি উদ্যোগ	২৯
১০	পরিবেশবান্ধব ও জলবায়ু-সহনশীল টেকসই বাজার ব্যবস্থাপনা	৩১
১১	প্রাণীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষার নয়া দিগন্ত প্রাণিসম্পদ বীমা	৩২
১২	প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে নারী এবং নারীর উন্নয়নে প্রাণীসম্পদ	৩৫
সাফল্যের গল্পকথা		
১৩	দুধওয়ালা: স্বপ্নবাজ তিন তরুণের স্বপ্ন আর সাফল্য	৪১
১৪	একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ আদর্শ খামারি মিজানুর রহমানের গল্পগাথা	৪৪
১৫	কুড়িগ্রামের সফল খামারি রিনা বেগম	৪৭
১৬	আমোনা বেগমের স্বপ্নযাত্রা	৫০
১৭	ফেরিওয়ালা থেকে ব্যবসায়ী গাইবান্ধা জেলার সাদুল্লাপুর উপজেলার "শেখ দই ঘর"	৫৩
১৮	মুরগি খামারি ছালমার স্বপ্ন থেকে সাফল্য	৫৫
১৯	একটি বায়োগ্যাস প্লান্ট সফিউল বর খোকনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির গল্প	৫৭

ক্রঃ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা
২০	স্বাবলম্বী সাথী রানীর স্বপ্ন ও সাফল্য	৫৯
২১	তালবারি কৃষি খামার: বজ্য থেকে শক্তি, শক্তি থেকে সবুজ বিপ্লব	৬২
২২	শূন্য থেকে সমৃদ্ধি- সফল খামারি শাহিন আক্তারের পথচলা	৬৩
২৩	গরু মোটাতাজা করে স্বপ্নপূরণের পথে হেলাল উদ্দিন	৬৫
২৪	ডেইরি খামারি আমজাদ হোসেনের ঘুরে দাঁড়ানো	৬৭
২৫	স্কুল মিল্ক কর্মসূচি স্কুল শিক্ষার্থীদের প্রাণিজ পুষ্টির যোগান	৭০
২৬	মনজিলা খাতুনের জীবন ও জীবিকার গল্প	৭৬
২৭	ছাগল পালনে মাজকুরা বেগমের চমক	৭৮
২৮	শ্যামল হোসেনের উন্নত জাতের ঘাস চাষ	৮১
২৯	দুধ খামারি ছাবির উল্লাহর সাফল্য	৮৪
৩০	একজন সফল নারী উদ্যোক্তা আফরোজা খাতুন	৮৭
৩১	মিল্কিং মেশিন ও রেজাউল করিম	৮৯
৩২	সাফল্যের পথে অঞ্জনা বড়ুয়া	৯২
৩৩	মিল্ক চিলিং পয়েন্ট ফিরোজ মিয়া সাফল্যের কেন্দ্রবিন্দু	৯৫
৩৪	স্মল স্কেল ফিড মিলস খামারি মোঃ আব্দুর রাজ্জাকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি	৯৮
৩৫	স্মল স্কেল ফিড মিলস খামারি মোস্তাকিম চৌধুরীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি	১০০
৩৬	মোঃ তোহিদ ইবনে হুমায়ূন অদম্য পরিশ্রম ও সাফল্যের উদাহরণ	১০২
৩৭	একটি মিল্ক ক্রিম সেপারেটর এবং স্বাবলম্বী কাজী কুমকুম আখতারের গল্প	১০৫
৩৮	শিক্ষক ও সফল খামারি আতা উল্লাহ	১০৭
৩৯	প্রযুক্তির ছোঁয়ায় দুধ উৎপাদনে আবছার উদ্দীন মোঃ রাসেলের সাফল্য	১১০
৪০	প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প: সফলতার খন্ডচিত্র	১১৩

প্রাণিসম্পদের টেকসই উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ ও দুগ্ধ খাতকে আধুনিক, উৎপাদনশীল ও টেকসই কাঠামোর আওতায় আনতে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। প্রকল্পটি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর-এর তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং সারাদেশে খামারি ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ইতোমধ্যে ৪৬৬টি উপজেলায় ৬,৫০০টি প্রডিউসার গ্রুপ (PG) গঠিত হয়েছে, যেখানে প্রায় ২,৪২,৫৮৩ জন খামারি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৫৫ শতাংশের বেশি নারী, যা নারী ক্ষমতায়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। দুগ্ধ, গবাদিপশু, ক্ষুদ্র রোমন্থক ও পোলট্রি ভ্যালু চেইনে এসব খামারিকে যুক্ত করার মাধ্যমে উৎপাদন ও আয় উভয় ক্ষেত্রেই ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে।

প্রাণিসম্পদ সেবা কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে সারা দেশে মোট ৪৭৫টি এমভিসি ক্রয় করা হয়েছে, যেগুলো দেশজুড়ে প্রায় সকল উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে প্রাণি-চিকিৎসা সেবা প্রদানের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সারা দেশে মোট ২৩৮টি উপজেলায় উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার দপ্তরে ফার্মিচারসহ প্রশিক্ষণ কক্ষ তৈরি করা হয়েছে, যার ফলে উপজেলা পর্যায়ে কোনো প্রশিক্ষণের জন্য পৃথক ভেন্যু ভাড়া করার প্রয়োজন হয় না। নিজস্ব ক্যাম্পাসে প্রশিক্ষণ আয়োজনের সুবিধা থাকায় খামারী বা কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের কাজটি অধিকতর সহজ হয়েছে।

এলডিডিপি প্রকল্পের আওতায় লাইভস্টক ফার্মার্স ফিল্ড স্কুল (LFFS), প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, টিকাদান, রোগ নজরদারি, কৃত্রিম প্রজনন ও খামারি প্রোফাইলিং কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। একইসঙ্গে ব্যাংক হিসাব খোলা ও সমবায় সঞ্চয়ের মাধ্যমে খামারীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন পরীক্ষাগারসমূহে যন্ত্রপাতি স্থাপনপূর্বক আধুনিকীকরণ করা হয়েছে, যা অধিদপ্তরের সক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে। জেলা পর্যায়ে ৬১টি জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতালে এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালে ১৫০টি ডায়াগনস্টিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে একদিকে পরীক্ষাগারসমূহ সমৃদ্ধ হয়েছে এবং অপরদিকে মানবসম্পদেরও যথেষ্ট উন্নয়ন হয়েছে। এছাড়াও এ

প্রকল্পের মাধ্যমে FDIL এবং CDIL-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ডায়াগনস্টিক এবং গবেষণা ল্যাবগুলিকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে এবং জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ৮টি উপ-পরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র (DD-AI building) স্থাপন করা হয়েছে। বিসিএস লাইভস্টক একাডেমিকে একটি জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সার্বিক (আর্থিক ও কারিগরী) সহায়তা প্রদানেও রয়েছে এলডিডিপি প্রকল্পের ভূমিকা।

এছাড়াও এ প্রকল্পের মাধ্যমে রাফেজ বেইলিং, স্মল স্কেল ফিড মিল, TMR, ফিড ও ফোডার উৎপাদন, ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ম্যানিউর এন্টারপ্রাইজ, মিল্ক কালেকশন ডেইরি হাব, VMCC, মিল্ক কুলিং ও প্রসেসিং প্রযুক্তিতে ৪০৪ ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বড় উদ্যোগকে ম্যাচিং গ্রান্টের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ১৩৫টি ওয়েট মার্কেট নির্মাণ ও হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ১৩টি জেলা শহরে আধুনিকমানের জেলা কসাইখানা (স্লটার হাউজ) নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন।

প্রকল্পের অধীনে প্রতিদিন ৬০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী প্রতি ২০০ মিলি করে মোট ১,৬০,০০০ শিক্ষার্থীর মাঝে দুধ পান করার কর্মসূচি অব্যাহত আছে যেটা শিক্ষার্থীদের পুষ্টি ও মেধা বিকাশের সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের অংশ হিসেবে প্রকল্পটি আইন প্রণয়নে সহায়তার মাধ্যমে ডেইরি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (DDB) গঠন করে, যা বাংলাদেশের দুগ্ধ খাতে একটি শক্তিশালী নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি তৈরি করেছে। সাভারে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জমিতে ডেইরি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড এর জন্য একটি স্থায়ী অফিস স্থাপন করা হয়েছে, যা ভবিষ্যতে ডেইরি খাতটির সমন্বিত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এলডিডিপি প্রকল্পের অগ্রগতি দেশের প্রাণিসম্পদ খাতকে বাণিজ্যিকীকরণ, পুষ্টি নিশ্চিতকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান

বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক অগ্রগতি, দারিদ্র বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রাণিসম্পদ খাত এক অনন্য ভূমিকা পালন করছে। প্রাণিসম্পদ খাত আজ দেশের একটি অন্যতম প্রধান উন্নয়নমুখী খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। প্রায় ১৫ লক্ষ প্রান্তিক খামারি তাদের দৈনিক জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম হিসেবে ২-৩টি করে পশু পালন করে থাকেন। পবিত্র ঈদুল আজহা তথা কোরবানিকে কেন্দ্র করে প্রায় ৮ লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক খামারি গবাদিপশু লালন-পালন করেন। দেশের মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ প্রাণিসম্পদ খাতের উপর নির্ভরশীল। শুধু পোল্ট্রি খাতেই প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়োজিত, যার মধ্যে ৪০ শতাংশই নারী।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৮১ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ৩.১৯ শতাংশ। কৃষিজিডিপিতে এ খাতের অবদান ১৬.৫৪ শতাংশ। দেশে বর্তমানে প্রায় আড়াই কোটি গরু, ১৫ লক্ষ মহিষ, ৩ কোটি ছাগল-ভেড়া এবং ৪০ কোটি হাঁস-মুরগি রয়েছে। এ সকল গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির মাধ্যমে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন দুধ, ৮৯.৫৪ লক্ষ মেট্রিক টন মাংস এবং ২৪৪০ কোটি ডিম উৎপাদন হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রান্তিক খামারিদের কারিগরি প্রশিক্ষণ, বাচ্চা সরবরাহ, খাদ্য, ভ্যাকসিন ও ওষুধ প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরি ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পের পর দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী খাত হিসেবে পোল্ট্রি শিল্প ইতোমধ্যে স্থান দখল করে নিয়েছে। এই খাতে বর্তমানে বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৪০,০০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন ৫০টি হাঁস-মুরগির খামার থেকে বছরে ৩৫ লক্ষ একদিনের বাচ্চা সরবরাহ করে। বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২.৭২ লক্ষ অনগ্রসর জনগোষ্ঠী/নৃ-গোষ্ঠী/চরাঞ্চলের প্রান্তিক খামারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও উৎপাদন উপকরণ বিতরণ; ২,৬১১ টি কৃষক সংগঠন ও ৬,৫০০ টি উৎপাদনকারী সংগঠন সৃজন হয়েছে। এছাড়াও, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে উপকরণ সহায়তা বাবদ ৭৫৮৪ টি বকনা বাছুর, ১২ টি মহিষ, ১৫৭৩৮ টি ছাগল, ৭৭০৭৭ টি ভেড়া, ৪৮৬০৯৫ টি মুরগি, ৮৫৫৪৫৫ টি হাঁস এবং ২৩৯৮৮ টি গবাদিপশু-পাখির গৃহনির্মাণ উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। অধিকন্তু, অর্থনৈতিক গুরুত্ববহ জুনোটিক রোগ নিয়ন্ত্রণে অপসারিত গবাদিপশুর ক্ষতিপূরণ বাবদ ২.৬৬ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। দেশে পোল্ট্রি ও ডেইরি খাতের উন্নয়নের সাথে সাথে বাণিজ্যিক পশুখাদ্য

উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বিকাশ লাভ করেছে। দেশে বছরে প্রায় ৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন পোল্ট্রি, ডেইরি ও মৎস্য খাদ্য উৎপাদন হয়। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত ফিড মিলের সংখ্যা ৩৪২ টি। মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০ এবং পশুখাদ্য বিধিমালা ২০১৩ অনুসরণপূর্বক এই সমস্ত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ এবং পশুখাদ্য বিধিমালা, ২০১৩ এর আওতায় ফিডমিল, পশুখাদ্য উপকরণ এবং খাদ্য আমদানী ও বিক্রয় প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়েছে ৭৪৬৮৯ টি; পশুখাদ্য নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৫৭৭৩টি; মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে ১৪২৬টি; জন্মকৃত ও বিনষ্টকৃত ভেজাল পশুখাদ্য ৯৮১ মেট্রিক টন; কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে ৫৪ জনকে এবং আদায়কৃত জরিমানার পরিমাণ ৫৫.৯৪ লক্ষ টাকা। মানুষের পুষ্টি নিরাপত্তায় প্রাণিকে গুণগতমানের খাদ্য উপকরণ প্রদান এবং প্রাণি হতে নিরাপদ প্রাণিজাত খাদ্য উৎপাদন অপরিহার্য হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অধীনে আন্তর্জাতিক মানের আইএসও সার্টিফাইড একটি কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে।

দেশের শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির অপর একটি খাত হলো দেশের ডেইরি খাত। বর্তমানে দেশে প্রায় ২.৫ কোটি গবাদিপশুর মধ্যে ৮৬ লক্ষ দুগ্ধবতী গাভি রয়েছে, যার মধ্যে ৪৫ লক্ষ দেশীয় গাভি এবং ৪১ লক্ষ সংকর জাতের গাভি। দুগ্ধ খাতে শতকরা ৮০ ভাগ খামারি প্রান্তিক, ভূমিহীন কৃষক ও নারী, যারা মোট উৎপাদিত দুধের শতকরা ৭০ ভাগ যোগান দিয়ে থাকে। আমাদের দেশী জাতের গবাদিপশুর উৎপাদনশীলতা বাড়াতে উন্নত জাতের গবাদিপশুর সিমেন্ট সংগ্রহ করে অনুমোদিত নীতিমালার ভিত্তিতে দেশী গাভীর কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, উপ-কেন্দ্র ও পয়েন্টের মাধ্যমে হিমায়িত ও তরল সিমেন্ট ব্যবহার করে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে যা একটি সফল কার্যক্রম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক ৩৭ লক্ষ ৫৯ হাজার ডোজ (তরল ও হিমায়িত) সিমেন্ট দ্বারা ৩৩ লক্ষ ৪৫ হাজার কৃত্রিম প্রজনন সম্পন্ন করা হয়েছে যাতে ১৫ লক্ষ ৭৩ হাজার শংকর জাতের বাছুর উৎপাদন হয়েছে। এছাড়াও, স্থানীয় জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়নে (যেমন-রেড চিটাগাং ক্যাটেল, মীর কাদিম, পাবনা নর্থ বেঙ্গল গ্রে ও নেত্রকোণা ব্ল্যাক) পৃথক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অন্যতম অতীষ্ট লক্ষ্য। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক, যুব মহিলা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষককে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনে সম্পৃক্ত করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক মোট ২ লক্ষ ৭২ হাজার জন বেকার যুবক, যুব মহিলা, দুস্থ মহিলা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষককে গবাদিপশু ও

হাঁস-মুরগি পালন, খাদ্য বিক্রেতা ও ঘাস চাষের উপর এবং ১৮,২৪৫ জন মাংস প্রক্রিয়াজাতকারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে নিরাপদ পন্য উৎপাদন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব ঘোচানোর চেষ্টা করা হয়েছে। অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়নেও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কাজ করছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল, সিলেট ও সুনামগঞ্জের হাওড়ের মহিষের প্রাপ্যতা ও উৎপাদন বেশি হয়ে থাকে। সরকারি ৩টি মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামার (বাগেরহাট মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামার, টাঙ্গাইল মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামার এবং মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামার সাভার, ঢাকা) হতে ভূত্বিক মূল্যে এসকল হাওড় ও বিভিন্ন অঞ্চলে খামারিদের মাঝে মহিষের বাচ্চা সরবরাহ করা হয়ে থাকে। উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে উঠা নিত্য নতুন চর ও সরকারি খাস জমি খামারিদের মাঝে চারণভূমি হিসেবে ব্যবহারের জন্য সমবায়ভিত্তিক বন্দোবস্ত প্রদান করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের সাথে কাজ করা হচ্ছে যাতে এসকল অঞ্চলের সাধারণ জনগোষ্ঠী মহিষ পালনে আরো উৎসাহী হয়।

প্রাণি স্বাস্থ্যের উন্নয়নে একটি বাধা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের রোগ-বালাই। এসকল রোগ প্রতিরোধে প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে প্রতিবছর ১৭টি রোগের প্রায় ৩৪ কোটি ডোজ গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির টিকা উৎপাদন ও বিতরণ করা হচ্ছে। সম্প্রতি উদ্ভূত গবাদিপশুর লাম্পি স্কিন ডিজিজ (LSD) রোগ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে প্রায় ১৭ লক্ষ মাত্রা টিকা মাঠ পর্যায়ে প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, গবাদিপশুর অন্যতম ক্ষুরা রোগ (FMD) মুক্ত অঞ্চল তৈরীর লক্ষ্যে দেশের ৪ টি জেলায় (সিরাজগঞ্জ, পাবনা, মানিকগঞ্জ ও ভোলা) টিকাদান কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে যা চলমান রয়েছে। সারাদেশ থেকে ছাগলের মারাত্মক সংক্রামক রোগ পিপিআর (PPR) নির্মূলে প্রায় ৬ কোটি ডোজ টিকা সাম্প্রতিক সময়ে মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রাণী থেকে মানব দেহে ছড়ায় এরকম সংক্রামক জুনোটিক রোগ যেমন- এ্যানথ্রাক্স, বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু, জলাতংক, নিপা ভাইরাসসহ অনেক জুনোটিক রোগ পরীক্ষণে ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরির স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি ট্রান্সবাউন্ডারি প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণকল্পে দেশের জল, স্থল ও বিমানবন্দরসমূহে মোট ২৪টি কোয়ারেন্টাইন স্টেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে ঢাকায় ০১টি জাতীয় চিড়িয়াখানা ও রংপুরে ১টি বিনোদন উদ্যান চিড়িয়াখানা আছে। বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা ১৯৬৪ সালে মিরপুর ঢাকায় প্রায় ১৮৬ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানায় বর্তমানে ১৩৫ প্রজাতির ৩৩২৫টি প্রাণি রয়েছে। বছরে প্রায় ৪০-৪৫ লক্ষ দর্শনার্থী এ চিড়িয়াখানা পরিদর্শন করে। চিড়িয়াখানা থেকে প্রায় ১৫ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়। জনসাধারণের জন্য নির্মল চিত্ত বিনোদনের একটি

অন্যতম মাধ্যম ছাড়াও চিড়িয়াখানা আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে যেমন: ক) দূর্লভ ও বিরল প্রজাতির পশু-পাখি পালন, সংরক্ষণ ও প্রজননের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি, খ) ছাত্রছাত্রী ও শিশু কিশোরদের বন্যপ্রাণি বিষয়ে শিক্ষা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা এবং গ) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকদের গবেষণা কাজে সহায়তা করা।

পবিত্র রমজান মাসে নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীর কাছে স্বল্পমূল্যে প্রাণিজ আমিষ সরবরাহের লক্ষ্যে ২০২৫ সালে পবিত্র রমজান মাসে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে এবং খামারিদের সহযোগিতায় মোট ৪৯৫টি ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে দুধ, মাংস ও ডিম পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এই বিশেষ উদ্যোগের মাধ্যমে এ বছর ৯ লক্ষ ৬৮ হাজার জন ভোক্তার মাঝে মোট ৩১ কোটি ৭৩ লক্ষ ১২ হাজার টাকার সমমূল্যের প্রাণিজ পণ্য বিক্রয় করা হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক রোগ প্রতিরোধক টিকাবীজ বিক্রয়, কৃত্রিম প্রজনন ফি, ফার্ম ও কোম্পানীসমূহের রেজিস্ট্রেশন ফি, চিড়িয়াখানা ও সরকারি খামারসমূহ হতে আয় এবং টেন্ডারসহ অন্যান্য খাত থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট রাজস্ব প্রাপ্তির পরিমাণ ৮৫ কোটি ২৩ লক্ষ ২১ হাজার টাকা। রপ্তানী আয়ের ক্ষেত্রে তৈরী পোষাক ও হিমায়িত চিংড়ী রপ্তানীর পরই অবস্থান চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের। প্রতিবছর বাংলাদেশ চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যাদি রপ্তানির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে থাকে। বর্তমানে সীমিত আকারে গরু এবং ছাগলের মাংস, প্রাণি উপজাত দ্রব্যাদি যেমন হাড়, নাড়িভুঁড়ি, জেনিটাল অর্গান রপ্তানী শুরু হয়েছে। এ ছাড়াও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি যেমন দই, মিষ্টি রপ্তানী করা হচ্ছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এর মূল্যায়নে ছাগল পালনে বাংলাদেশ বিশ্বে ৪র্থ স্থান এবং ছাগলের মাংস উৎপাদনে বিশ্বে ৫ম স্থান অধিকার করেছে। ইতোমধ্যে বাণিজ্যবাধা দূরীকরণে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে একটি ট্রেড উইং স্থাপন করা হয়েছে।

বিপুল বিস্তৃত প্রাণিসম্পদ খাতে যে সকল উদ্যোক্তা কাজ করছেন তাদের উদ্বুদ্ধ করা, এই সেক্টরে তরুণদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা এবং এই খাতের গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করা, প্রাণিসম্পদ খাতে যে সকল প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে তা উপস্থাপন করা, আকর্ষণীয় স্থানীয় উন্নত জাতের গবাদিপশু ও পোল্ট্রির প্রদর্শন করা এবং বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যবাহী ও বাহারি প্রাণিজ খাবারের সাথে সকলকে পরিচিত করানোর লক্ষ্যে এ বছরই প্রথম “জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ২০২৫” পালন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ ব্যাড্‌জিং হবে, আরও অনেক মানুষ এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত হবে, নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে, উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, জীবনমান উন্নত হবে, সর্বোপরি দেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হবে।

জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ-২০২৫ প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ২০১৯ সাল হতে সারাদেশে প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ উদযাপন করেছে। জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ'র সরকারি স্বীকৃতির লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে প্রতিবছর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয় এবং প্রস্তাবের আলোকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সার সংক্ষেপ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করে। কিন্তু দীর্ঘ সাত বছর এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা যায়নি। অবশেষে ২৪ জুলাই ২০২৫ তারিখে অধিদপ্তর হতে আবারও প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করে সারসংক্ষেপ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় উপদেষ্টা পরিষদের সভায় জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ উদযাপনের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ফরিদা আখতার এর নির্দেশে সচিব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের ৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে “জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ” উদযাপনের প্রস্তাব উপস্থাপন করলে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে প্রতিবছর নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে “জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ” উদযাপনের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। “জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ” উদযাপনের প্রস্তাব অনুমোদন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি। ২০২৫ সালে প্রথমবারের মতো জাতীয় পর্যায়ে “প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ” উদযাপন দেশের প্রাণিসম্পদ খাতকে আরও আধুনিক, জনসম্পৃক্ত ও প্রযুক্তিনির্ভর খাতে রূপান্তর করার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানঃ

২৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ১০ টায় শের-ই-বাংলানগর আগারগাঁও ঢাকায় বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে, জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ২০২৫ এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দীন মাহমুদ। জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ২০২৫ উপলক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউনুস এর ভিডিও বার্তা প্রচার করা হয়।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের

সচিব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের, এবং পদক বিতরণ অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোঃ আবু সুফিয়ান।

পদক প্রদানঃ

জাতীয় প্রাণিসম্পদ পদক নীতিমালার আলোকে এ বছর প্রাণিসম্পদে বিশেষ অবদানের জন্য ৫টি ক্ষেত্রে মোট ১৫ টি প্রদান করা হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে ১টি স্বর্ণ, ১টি রৌপ্য এবং ১টি ব্রোঞ্জ পদক এবং যথাক্রমে ৫০,০০০.০০, ৩৫,০০০.০০ এবং ২৫,০০০.০০ টাকা দেয়া হয়।

পদকের ক্ষেত্রসমূহঃ- ১. গবাদিপশুর খামার, ২. পোল্ট্রি খামার, ৩. প্রাণি ও প্রাণিজাত পণ্য, ৪. প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা, ৫. প্রান্তিক খামারি ও নারী।

পদক প্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহঃ

গবাদিপশুর খামারঃ স্বর্ণ পদক- ডাচ ডেইরি লিমিটেড, মোঃ জিল্লুর রহমান মৃধা, সাতঘড়িয়া, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ; রৌপ্য পদক- সুপ্রিম ইকো ব্রিক্স এন্ড এগ্রো লিঃ, মোঃ আকমল হোসেন, পূর্ব শুলশুলিয়া, টোপেরবাড়ী, ধামরাই, ঢাকা; ব্রোঞ্জ পদক- তন্ময় ডেইরি খামার, মোঃ আমিরুল ইসলাম, বুড়ারামপুর, লক্ষ্মীকুড়া, ঈশ্বরদী, পাবনা।

পোল্ট্রি খামারঃ স্বর্ণ পদক-মেসার্স এসএসবি পোল্ট্রি ও হ্যাচারী কমপ্লেক্স, মোঃ ইসমাইল হোসেন টুকু, রকিন্দীপুর, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট; রৌপ্য পদক-পদ্মা ফিড এন্ড চিকস লিঃ, মোঃ আনোয়ারুল হক, বনবিভাগ রোড, হাতিল, জয়পুরহাট; ব্রোঞ্জ পদক- আব্দুর রহিম মৎস্য ও পোল্ট্রি খামার, মোঃ আব্দুর রহিম, ঝালুকা, আমগাছী, দুর্গাপুর, রাজশাহী।

প্রাণি ও প্রাণিজাত পণ্যঃ স্বর্ণ পদক-দুধওয়ালা ফুড প্রোডাক্টস, মোঃ মোতাহের হোসেন, ২৫/এ, বিসিক শিল্প নগরী, খাদিমনগর, সিলেট; রৌপ্য পদক-বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ, জাহিদুল ইসলাম, ১৩৯-১৪০ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা; ব্রোঞ্জ পদক-এশিয়া সুইটমিট, জনাব মোঃ নুরুল বাসার (চন্দন), ডাঃ ইসাহাক লেন, সূত্রাপুর, বগুড়া।

প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনাঃ স্বর্ণ পদক-হীড বাংলাদেশ, সুব্রত কাম্পু, কেরামত নগর, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার; রৌপ্য পদক-ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, মো. শহীদ উজ-জামান, গোবিন্দনগর, সদর, ঠাকুরগাঁও; ব্রোঞ্জ পদক-মমতা ডেইরি ফার্ম ট্রেনিং এন্ড ডেমনস্ট্রেশন সেন্টার, তৌহিদ আহমেদ, চরকানাই, হাবিলাসদ্বীপ, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রান্তিক খামারি ও নারীঃ স্বর্ণ পদক-বেগম পিংকি, প্রয়োজন খামার, আবু বক্করপুর, ৯নং ওয়ার্ড, চরফ্যাশন, ভোলা, রোপ্য পদক-মোছা: পারভীন পিয়ারী, পারভীন দেশী মুরগির খামার, কুসুমশহর, বড়াইল, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট; ব্রোঞ্জ পদক-সাবেরিন নাহার সারা, এফ আর এগ্রো ফার্ম, রঘুরামপুর, আদর্শ সদর, কুমিল্লা।

সেমিনার আয়োজনঃ

জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ২০২৫ উপলক্ষ্যে ৪টি সেমিনার আয়োজন করা হয়। আয়োজিত সেমিনারের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রাণিসম্পদ খাতের সার্বিক উন্নয়ন, উদ্ভাবনী প্রযুক্তির প্রসার, নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ, খামার ব্যবস্থাপনা এবং জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, নীতিনির্ধারক ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা। এই সেমিনার প্রাণিসম্পদ খাতের বর্তমান চ্যালেঞ্জ, বাজার সম্প্রসারণ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলা এবং টেকসই সেবা ব্যবস্থার রূপরেখা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সেমিনারে মোট ৪ টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। ১. প্রাণিসম্পদ খাতের সমস্যা সম্ভাবনা ও করণীয়; ২. জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান; ৩. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও টেকসই সেবা সম্প্রসারণ: সম্ভাবনা ও করণীয়; ৪. প্রাণিসম্পদ সেক্টর উন্নয়নে বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ। শীর্ষক প্রবন্ধ। সেমিনারের মাধ্যমে খামারি, বিনিয়োগকারী ও বিভিন্ন অংশীজনকে একই প্ল্যাটফর্মে এনে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের অবদান আরও শক্তিশালী করার সুযোগ সৃষ্টি করে। সেমিনারসমূহে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ফরিদা আখতার, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ এহছানুল হক, সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, মোঃ শাহরিয়ার কাদের ছিদ্দিকী এবং অর্থ বিভাগের সচিব ড. মোঃ খায়রুজ্জামান মজুমদার। সেমিনারসমূহে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. শাকিলা ফারুক, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, মোঃ শাহজামান খান, পরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, জনাব সামসুল আরেফিন খালেদ, প্রেসিডেন্ট, ওয়াপসা-বিবি, ডাঃ মোঃ শাহীনুর আলম, পরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ড. মোঃ মোস্তফা কামাল, পরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

জাতীয় প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহঃ

জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ২০২৫ উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রদর্শনীতে মোট ১৯৩টি প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। যাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শনীকে

বর্ণিল করে তোলে। অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহঃ ১. সরকারি ২০টি; ২.দেশীয় এবং সংকর জাতের গবাদিপশুর ৩৯টি; ৩. সৌখিন পোষা পশু পাখির ২৪টি; ৪. জেনেটিকস এবং যন্ত্রপাতির ২২টি; ৫. প্রাণিস্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান-১৮টি ৬. প্রাণিজ পণ্য প্রক্রিয়াকরণ ৪৬টি ৭. প্রাণিসম্পদ উপকরণ উৎপাদনকারী ২৪টি। প্রদর্শনীতে অনন্য আয়োজন ছিল দেশের ঐতিহ্যবাহী ও বাহারি খাবারের আকর্ষণীয় ফুড ফেস্টিভেল, যা মেলায় আগত দর্শনার্থীদের মাঝে আলাদা উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। দর্শনার্থীগণ খেয়েছেন এবং অনেকে খাবার বাসায় নিয়ে গেছেন।

সাধারণ মানুষের অভিব্যক্তিঃ

পুরাতন বাণিজ্য মেলা মাঠে অনুষ্ঠিত জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ২০২৫ উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীতে সাধারণ মানুষ গভীর আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে অংশগ্রহণ করেছে। তারা বিভিন্ন খামার প্রযুক্তি, উন্নত জাতের প্রাণী, দুধ, ডিম, মাংস উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং আধুনিক ভেটেরিনারি সেবার প্রদর্শনী দেখে মুগ্ধ হয়েছে। বিশেষ করে শিক্ষার্থী, নতুন উদ্যোক্তা ও সাধারণ খামারিরা নানা তথ্য জানতে পেরে ভবিষ্যতে উদ্যোক্তা হওয়ার বিষয়ে অনুপ্রাণিত হয়েছে। প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত উদ্ভাবনী প্রযুক্তি, রোগ নির্ণয় ব্যবস্থা, নানা ধরনের পশু খাদ্য ও এর ব্যবহার পদ্ধতি এবং জেনেটিক উন্নয়নের মডেল দেখে তারা প্রাণিসম্পদ খাতের অভাবনীয় অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা অর্জন করে।

এর ফলে এ খাত সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি জাহত হয়। এ প্রদর্শনী সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদন, পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা এবং খামার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে বড় ভূমিকা রেখেছে। দর্শনার্থীরা দেখেছেন যে প্রাণিসম্পদ খাত কেবল খাদ্য উৎপাদনই নয়, কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তারা মন্তব্য করেছেন এ ধরনের আয়োজন মানুষের জ্ঞান বাড়ায়, ভুল ধারণা দূর করে এবং খামার ভিত্তিক কর্মকাণ্ডে নতুন প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করতে সহায়তা করে। প্রদর্শনীটি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে ছিল তথ্যবহুল, অনুপ্রেরণাদায়ী ও প্রাণিসম্পদ খাতের সম্ভাবনা সম্পর্কে আশাব্যঞ্জক একটি অভিজ্ঞতা।

শিশু কিশোরের অভিব্যক্তিঃ

জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ২০২৫ উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীতে শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মত। তাদের মধ্যে ছিল উচ্ছ্বাস, কৌতূহল ও আনন্দের এক অনন্য অভিজ্ঞতা। তারা প্রদর্শনীতে থাকা বিভিন্ন প্রাণী-গরু, ছাগল, ভেড়া, খরগোশ, হাঁস-মুরগি, কবুতর, পোষা প্রাণি পাখিকে কাছ

থেকে দেখে অভিভূত হয়েছে। অনেকেই প্রথমবারের মতো আধুনিক খামার প্রযুক্তি, বিজ্ঞানভিত্তিক খাদ্য তৈরির মডেল ইত্যাদি দেখে প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নতুন জ্ঞান লাভ করেছে। বিশেষ করে স্কুলের শিক্ষার্থীরা প্রাণিসম্পদ খাতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের ভূমিকা বুঝতে পেরে শেখার প্রতি আরও উৎসাহী হয়েছে। প্রদর্শনীতে অংশ নিয়ে শিশু-কিশোররা প্রাণীর পরিচর্যা, খাদ্য, পুষ্টি, রোগ প্রতিরোধ এবং প্রাণি কল্যাণ সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন করেছে। বিভিন্ন স্টলে করা প্রশ্নোত্তর, শিক্ষামূলক ভিডিও, হাতে কলমে প্রদর্শনী এবং ইন্টারঅ্যাকটিভ কার্যক্রম তাদের কাছে শিক্ষাকে আরও মজাদার করে তুলেছে। অনেক শিশু কিশোর সাংবাদিকগণকে বলেছেন, তারা এই প্রথম বিপুল পরিমাণ পাখি ও প্রাণি দেখেছেন। তারা মনে করছে এই ধরনের আয়োজন শুধু বিনোদনের সাথে সাথে প্রাণিসম্পদ বিষয়ে আগ্রহ তৈরিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অনেকেই বলেছেন, এমন প্রদর্শনী নিয়মিত হলে তারা আরও বেশি শিখতে পারবে এবং দেশের প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে নিজেদের ভূমিকা কেমন হতে পারে তা বুঝতে পারবে।

মিডিয়ার ভূমিকাঃ

জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ২০২৫ উদযাপন এবং এই উপলক্ষ্যে সারাদেশে আয়োজন করা প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীতে মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেছে। টেলিভিশন, পত্রিকা, অনলাইন নিউজপোর্টাল এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইত্যাদিতে প্রচারিত হয়েছে অনুষ্ঠানের খবর, বিভিন্ন প্রতিবেদন, সাক্ষাৎকার ও সংবাদচিত্র, যা দেশের মানুষকে দ্রুত ও নির্ভুলভাবে প্রদর্শনীর তথ্য জানার সুযোগ করে দিয়েছে। মিডিয়ার ধারাবাহিক কাভারেজের ফলে প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য, নতুন প্রযুক্তি, উদ্ভাবনী উদ্যোগ, দুধ, ডিম, মাংস উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, রোগ নিয়ন্ত্রণ মডেলসহ নানা দিক সাধারণ মানুষের কাছে আরও স্পষ্টভাবে পৌঁছে গেছে। এতে প্রদর্শনীর প্রতি মানুষের আগ্রহ, অংশগ্রহণ ও ইতিবাচক মনোভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ ছাড়া মিডিয়া প্রাণিসম্পদ খাতের গুরুত্ব, পুষ্টি নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, গ্রামীণ অর্থনীতি, নারীর ক্ষমতায়ন, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতেও কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। প্রদর্শনী থেকে সংগ্রহ করা বাস্তব চিত্র, খামারিদের অভিজ্ঞতা, বিশেষজ্ঞদের মতামত এবং সফল উদ্যোক্তার গল্প তুলে ধরে এক ধরনের অনুপ্রেরণামূলক পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মিডিয়ার প্রচার প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে সরকারের উদ্যোগ, নতুন সম্ভাবনা ও বিনিয়োগের সুযোগ সম্পর্কে দেশব্যাপী আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে, যা ভবিষ্যতের পরিকল্পনা প্রণয়নে ও নীতিনির্ধারণে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ উদযাপনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হল-জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহকে আরও বৈচিত্র্যময়, তথ্যসমৃদ্ধ এবং দেশব্যাপী জনসম্পৃক্ততার একটি প্ল্যাটফর্মে পরিণত করা। আগামী বছরগুলোতে প্রযুক্তিনির্ভর প্রদর্শনী, ডিজিটাল লার্নিং কর্নার, যুব উদ্যোক্তা ফোরাম, স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ বিজ্ঞানভিত্তিক সেশন, জলবায়ুর পরিবর্তনে প্রাণিসম্পদের উপর প্রভাব নিরূপণ এবং ইন্টারঅ্যাকটিভ কার্যক্রম সাজানোর পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি জেলা উপজেলা পর্যায়ে প্রদর্শনীর ব্যাপকতা বাড়ানো, খামারিদের জন্য হাতে কলমে প্রশিক্ষণ, ভেটেরিনারি সেবা বিষয়ক সচেতনতামূলক ক্যাম্প আয়োজন এবং নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদন বিষয়ে নতুন মডেল প্রদর্শনের উদ্যোগ গ্রহণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

এ ছাড়া ভবিষ্যতে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানকে আরও গবেষণাভিত্তিক এবং উদ্ভাবনমুখী করতে বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি খাতের সঙ্গে সমন্বয় জোরদার করার পরিকল্পনা আছে। আরও অনেক সরকারি বেসরকারি সংস্থা, প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করা হবে। প্রাণিসম্পদ খাতের চ্যালেঞ্জ, রোগ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু ঝুঁকি, খামার ব্যবস্থাপনা, পুষ্টি নিরাপত্তা এবং বিনিয়োগ এসব বিষয়ে দিক নির্দেশনামূলক সেমিনার, নীতি সংলাপ ও বিশেষজ্ঞদের আলোচনা আয়োজন করার পরিকল্পনা আছে। একইসঙ্গে সাধারণ মানুষ, খামারি, নারী উদ্যোক্তা ও তরুণদের সম্পৃক্ততা বাড়িয়ে জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান আরও শক্তিশালী করাই হবে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ উদযাপনে আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মূল ভিত্তি। প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়ন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ণে সংশ্লিষ্ট সকলকে সহায়তা করা হবে। প্রাণিসম্পদ খাতের প্রচার ও জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ উদযাপন প্রচারের জন্য মিডিয়া পার্টনার হিসেবে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াকে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের জন্য মানসম্মত কসাইখানা

নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের জন্য প্রয়োজন মানসম্মত কসাইখানা। বাংলাদেশে প্রচলিত অস্বাস্থ্যকর কসাইখানা ও মাংসের দোকান জনস্বাস্থ্যের জন্য চরম ঝুঁকিপূর্ণ। নোংরা পরিবেশ, উন্মুক্ত স্থানে পশু জবাই, পচা-বাসি মাংস বিক্রি, এবং মরা বা অসুস্থ পশুর মাংস বিক্রির অভিযোগ প্রায়ই পাওয়া যায়। এসব দোকানে স্বাস্থ্যবিধি না মেনে মাটিতে বা অস্বাস্থ্যকর স্থানে মাংস কাটার ফলে বিষক্রিয়া ও নানা রোগের ঝুঁকি বাড়ে।

প্রচলিত অস্বাস্থ্যকর কসাইখানা ও মাংসের দোকানের সাধারণ চিত্র হচ্ছে: অধিকাংশ কসাইখানা ও দোকানে পর্যাপ্ত পানি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা নেই, যা পরিবেশ দূষিত করে; রাস্তা বা ড্রেনের পাশে, খোলা জায়গায় পশু জবাই করা হয় এবং মশা ও ধুলোবালি মেশা মাংস বিক্রি করা হয়; অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত লাভের আশায় পচা, দুর্গন্ধযুক্ত বা মৃত পশুর মাংস কম দামে বিক্রি করা হয়; মাংস বিক্রেতারা অপরিষ্কার কাপড় ব্যবহার করেন এবং যে কাঠের গুঁড়িতে মাংস কাটা হয়, তাতেও জীবাণু থাকে; যে কাঠের গুঁড়িতে মাংস কাটা হয় অনেক সময় সেখানে কুকুর শুয়ে থাকতে দেখা যায়; অনেক স্থানে নির্দিষ্ট বা অনুমোদিত কোনো কসাইখানা নেই, যেখানে জবাই করার আগে পশু স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। অস্বাস্থ্যকর মাংসের কারণে ডায়রিয়া, ফুড পয়জনিং, টাইফয়েড, যক্ষ্মাসহ নানা পানিবাহিত ও খাদ্যবাহিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসম্মত, পরিবেশবান্ধব, টেকসই এবং জলবায়ু-সহনশীল কসাইখানা নির্মাণ একটি সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। যদিও রাজধানী শহরে কিছু আধুনিক কসাইখানা রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ জেলা শহরে দীর্ঘদিন ধরে উন্নতমানের অবকাঠামোর অভাব লক্ষ্য করা গেছে। পূর্বে কিছু বিভাগীয় শহরে উন্নতমানের কসাইখানা নির্মাণের চেষ্টা করা হলেও দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে তা টেকসইভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি।

এই প্রেক্ষাপটে, “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প” এর আওতায় দেশের বিভিন্ন জেলা শহরে মোট ১৩টি আধুনিক জেলা কসাইখানা নির্মাণ করা হয়েছে। এই কসাইখানাগুলো স্থানীয় পৌর কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হবে। দীর্ঘমেয়াদী এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে একটি সুসংগঠিত জেলা কসাইখানা পরিচালনা নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে, যা কর্তৃপক্ষকে কার্যকরভাবে পরিচালনার একটি গাইডলাইন প্রদান করবে।

“প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প” এর আওতায় নির্মিত জেলা কসাইখানায় দুটি জবাইখানার বিধান রয়েছে। বড়টি গরু, মহিষের জন্য আর ছোটটি ছাগল, ভেড়া জবাই করার জন্য। কসাইখানার মধ্যে থাকবে পশুর জন্য অপেক্ষা বা হোল্ডিং এরিয়া, যান্ত্রিক হালাল ও প্রচলিত জবাইয়ের ব্যবস্থা, প্রি-ডিহাইডিং ও হাইডিং ইউনিট, নাড়ি-ভুড়ি অপসারণ, লিপিটিং, চিলিং এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় স্টার ওয়েস্ট-বেজড বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ও ফিল্টার বেড স্থাপন করা হয়, যা পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিত করছে। এই আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত জেলা কসাইখানাগুলো স্বাস্থ্যসম্মত ও টেকসই পশু জবাই করার মাংস প্রক্রিয়াকরণের একটি মডেল অবকাঠামো হতে পারে। এই মডেল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষ করে সিটি করপোরেশনসমূহ এবং পৌরসভাসমূহ অনুসরণ করতে পারে।

পরিচালনা ও টেকসই ব্যবস্থাপনা

দীর্ঘমেয়াদী টেকসই কার্যক্রম নিশ্চিত করার জন্য কসাইখানাগুলোতে পশু সরবরাহ, বিপণন কৌশল, মূল্য নির্ধারণ, গ্রাহক সেবা, আইনি অনুমোদন এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার একটি সমন্বিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা অপরিহার্য। স্থানীয় খামার ও প্রডিউসার গ্রুপের সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলে নিয়মিত ও উচ্চমানের পশু সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। এছাড়া অনলাইন ও অফলাইনের মাধ্যমে বিপণন, সঠিক মূল্য নির্ধারণ, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে মাংস সরবরাহ, ব্র্যান্ডেড প্যাকেটজাত পণ্যের বিক্রয় এবং লাইসেন্স ও অন্যান্য আইনি বাধ্যবাধকতা অনুসরণ করা হবে।

কসাইখানা পরিচালনার জন্য তিনটি সম্ভাব্য মডেল প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রথম, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) যেখানে সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদে যৌথভাবে কসাইখানা পরিচালনা করবে। দ্বিতীয়, ব্যবসায়িক মডেলে লীজ প্রদান, যেখানে কসাইখানাটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দক্ষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট লিজ দেওয়া হবে। তৃতীয়, সংশ্লিষ্ট পৌর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কসাইখানা পরিচালনা। স্থানীয় আর্থিক ও কারিগরি সক্ষমতা বিবেচনায়, জেলা পর্যায়ে স্থানীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে সর্বাধিক উপযোগী ও টেকসই এবং কার্যকরী ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করা হবে। বেসরকারি পর্যায়ে লিজ প্রদানের মাধ্যমে পরিচালনা করা যেতে পারে।

লীজ ভিত্তিক ও পৌরসভা কর্তৃপক্ষের পরিচালনার শর্তাবলী লীজ ভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় ত্রিপাক্ষিক চুক্তি, যথাযথ যানবাহন, প্রশিক্ষিত জনবল, আর্থিক সক্ষমতা, বীমা ব্যবস্থা, নিয়মিত যন্ত্রপাতি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার রক্ষণাবেক্ষণ এবং

সকল প্রয়োজনীয় লাইসেন্স, অনুমোদন, ট্যাক্স ও ভ্যাটের সঠিক পরিশোধ নিশ্চিত করা হবে। পৌর কর্তৃপক্ষ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার ক্ষেত্রে একই ধরনের প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সক্ষমতা প্রয়োজন হবে।

মনিটরিং এবং তদারকি

জেলা কসাইখানার কার্যক্রমের মনিটরিং ও তদারকির জন্য জেলা কসাইখানা মনিটরিং ও সুপারভিশন কমিটি গঠন করার পরিকল্পনা রয়েছে। কমিটিতে জেলা প্রশাসক আহ্বায়ক হিসেবে থাকবেন, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, কসাইখানা পরিচালনাকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং পৌর মেয়র বা প্রশাসক সদস্য হিসেবে থাকবেন। কমিটি কসাইখানার ভাড়া নির্ধারণ, বিরোধ মিমাংসা, পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণ, রাজস্ব আদায়, স্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণ এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনা তদারকি করবে।

প্রত্যাশিত ফলাফল ও ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা

চলমান নির্মাণ ও পরবর্তী পরিচালনা পরিকল্পনার মাধ্যমে, জেলা কসাইখানাগুলো স্বাস্থ্যসম্মত, পরিবেশবান্ধব, টেকসই এবং জলবায়ু-সহনশীল প্রাণিসম্পদ অবকাঠামোর একটি শক্তিশালী উদাহরণ হয়ে উঠবে। এটি নিরাপদ মাংসের প্রাপ্যতা ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করবে, স্থানীয় অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানকে শক্তিশালী করবে।

মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক সক্ষমতা উন্নয়নের রূপান্তরমূলক উদ্যোগ

মাঠ পর্যায়ে প্রাণিসেবা শক্তিশালীকরণে মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সক্ষমতা উন্নয়নের একটি রূপান্তরমূলক উদ্যোগ বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ খাত গ্রামীণ অর্থনীতি, পুষ্টি নিরাপত্তা এবং টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে একটি কৌশলগত ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনের মাধ্যমে এই খাত শুধু খাদ্য চাহিদা পূরণই করেছে না, বরং লাখো ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক খামারির জীবিকা নিশ্চিত করেছে। তবে দীর্ঘদিন ধরে একটি মৌলিক কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান ছিল, প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলে সময়োপযোগী ও মানসম্মত প্রাণি-চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থার অভাব।

এই প্রেক্ষাপটে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প” (এলডিডিপি) এর আওতায় মাঠ পর্যায়ে সেবার পরিধি ও গুণগত মান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে একটি কৌশলগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক প্রবর্তন, সংক্ষেপে যাকে বলে এমভিসি। এই উদ্যোগের মাধ্যমে সেবাকে অফিস কেন্দ্রিক, ক্লিনিক কেন্দ্রিক অবস্থা থেকে মুক্ত করে খামারির দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই রূপান্তর প্রাণিসেবা ব্যবস্থায় একটি যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা। গ্রামীণ খামারিরা প্রায়ই দূরবর্তী উপজেলা কার্যালয়ে পশু নিয়ে যেতে না পারায় জরুরি চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হতেন। ফলে রোগের জটিলতা বৃদ্ধি, উৎপাদন হ্রাস এবং অনেক ক্ষেত্রে গবাদিপশুর অকালমৃত্যু ঘটত। ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা, পরিবহন ব্যয় ও সময়সীমা এসব মিলিয়ে সেবাপ্রাপ্তিতে একটি বড় সংকট তৈরি হয়েছিল।

এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মোট ৪৭৫টি মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক তৈরি করার জন্য গাড়ী ক্রয় করা হয়। বিশেষভাবে সজ্জিত এসব গাড়ীতে প্রাথমিক ও জরুরি চিকিৎসা সরঞ্জাম, ভ্যাকসিন সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় ডায়াগনস্টিক উপকরণ সংযুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে দেশব্যাপী প্রায় সকল উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর এগুলো ব্যবহার করে গ্রামীণ খামারীদের প্রাণী সেবা প্রদান করেছে।

উদ্যোগটির কার্যকর ও টেকসই বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে একটি সুপরিকল্পিত ও বহুমাত্রিক কৌশল গ্রহণ করা হয়। দেশের প্রতিটি উপজেলা পর্যায়ে এমভিসি বরাদ্দ করা হয়েছে, যাতে প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকাসমূহ সমানভাবে সেবার আওতায় আনা হয়। প্রতিটি এমভিসি প্রশিক্ষিত ভেটেরিনারি সার্জন ও দক্ষ ফিল্ড স্টাফ দ্বারা

পরিচালিত হওয়ায় সেবার মান, পেশাগত দক্ষতা ও প্রাতিষ্ঠানিক নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত হয়েছে। নিয়মিত ও নিরবচ্ছিন্ন কার্যক্রম বজায় রাখতে চালক নিয়োগের মাধ্যমে অপারেশনাল ধারাবাহিকতা সুদৃঢ় করা হয়েছে। পাশাপাশি ঝড়-বৃষ্টি ও অন্যান্য প্রতিকূল আবহাওয়াতেও জরুরি চিকিৎসা সেবা অব্যাহত রাখার সক্ষমতা গড়ে তোলা হয়েছে, যা মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সাড়া প্রদান, ঝুঁকি হ্রাস এবং প্রাণি-স্বাস্থ্য সুরক্ষায় একটি কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে উঠেছে।

মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক (এমভিসি) প্রবর্তনের ফলে মাঠ পর্যায়ে বহুমাত্রিক ও দৃশ্যমান ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। সর্বপ্রথম, প্রাণিসেবা সরাসরি খামারির দ্বারগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে সময় ও পরিবহন ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে এসেছে, যা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক খামারিদের জন্য বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে। দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঝড়-বৃষ্টি কিংবা প্রতিকূল যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যেও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জামসহ দ্রুত সেবা প্রদান সম্ভব হওয়ায় সেবার ভৌগোলিক বৈষম্য কমেছে। একই সঙ্গে, কর্মকর্তাদের কর্মপরিবেশ ও কার্যসম্পাদন সক্ষমতা উন্নত হওয়ায় তাদের মানসিক সমৃদ্ধি ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে তাদের পেশাগত দায়বদ্ধতা ও কর্মদক্ষতা আরও জোরদার হয়েছে।

এমভিসি ক্রয়ের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের স্থায়ী সম্পদ সম্প্রসারিত হয়েছে, ফলে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা দীর্ঘমেয়াদে সুসংহত হয়েছে। জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদান দ্রুত নিশ্চিত হওয়ায় গবাদিপশুর মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, যা উৎপাদনশীলতা ও খামারিদের আয় সুরক্ষায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। পাশাপাশি এমভিসি পরিচালনার জন্য চালক নিয়োগের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যা স্থানীয় অর্থনীতিতেও ইতিবাচক অবদান রেখেছে।

একটি মানবিক উদাহরণ কুড়িগ্রামের এক প্রত্যন্ত গ্রামের একজন ক্ষুদ্র দুগ্ধ খামারি তার একমাত্র দুধাল গাভীর আকস্মিক অসুস্থতায় দিশেহারা হয়ে পড়েন। অতীতে এমন পরিস্থিতিতে উপজেলা কার্যালয়ে পৌঁছাতে সময় লেগে যেত, অনেক সময় প্রাণি বাঁচানো সম্ভব হতো না। কিন্তু এমভিসির মাধ্যমে ভেটেরিনারি টিম দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে চিকিৎসা প্রদান করে গাভীটিকে সুস্থ করে তোলে। এই একটি সেবা শুধু একটি প্রাণীকেই রক্ষা করেনি, রক্ষা করেছে একটি পরিবারের আয়, পুষ্টি ও ভবিষ্যৎ স্বপ্ন।

মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক উদ্যোগটি প্রমাণ করেছে যে সঠিক অবকাঠামো ও মাঠকেন্দ্রিক পরিকল্পনা প্রাণিসেবা ব্যবস্থায় ইতিবাচক ও রূপান্তরমূলক পরিবর্তন আনতে পারে। এটি শুধু একটি পরিবহন সুবিধা নয় এটি গ্রামীণ অর্থনীতি ও

প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় সেবা পৌঁছে দেওয়ার একটি নতুন দর্শন।

উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে প্রশিক্ষণ কক্ষ তৈরি

বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ খাতের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে মাঠ পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদার করা একটি অগ্রাধিকারমূলক কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প” (এলডিডিপি) এর আওতায় দেশব্যাপী ২৩৮টি উপজেলায় উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার দপ্তরে আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন, ফার্নিচারসহ প্রশিক্ষণ কক্ষ স্থাপন করেছে যা বিকেন্দ্রীকৃত সক্ষমতা উন্নয়নে একটি মাইলফলক উদ্যোগ হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে।

পূর্বে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য পৃথক ভেন্যু ভাড়া করতে হতো, যা সময়সাপেক্ষ, ব্যয়বহুল এবং অনেক ক্ষেত্রে লজিস্টিক জটিলতায় পরিপূর্ণ ছিল। নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত নিজস্ব প্রশিক্ষণ অবকাঠামো এই নির্ভরশীলতা দূর করেছে এবং প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও শাস্ত্রীয় করেছে। এখন উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের নিজস্ব ক্যাম্পাসেই নিয়মিত প্রশিক্ষণ, ওরিয়েন্টেশন, প্রযুক্তি হস্তান্তর সভা এবং খামারি সমাবেশ আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছে।

এই উদ্যোগের ফলে খামারি ও মাঠকর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম আরও সহজ, ধারাবাহিক ও কাঠামোবদ্ধ হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে জ্ঞান বিনিময়, সমস্যা বিশ্লেষণ এবং প্রযুক্তি প্রয়োগের অনুশীলন বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ পরিবেশ গড়ে উঠেছে। একই সঙ্গে, প্রশিক্ষণ ব্যয় কমে যাওয়ায় সরকারি সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে এবং অধিক সংখ্যক উপকারভোগীকে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

ফলে, উপজেলা পর্যায়ে একটি টেকসই জ্ঞানকেন্দ্রিক অবকাঠামো তৈরি হয়েছে, যা প্রাণিসম্পদ সেবার মানোন্নয়ন, প্রযুক্তি গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তি শক্তিশালীকরণে দীর্ঘমেয়াদে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এই অভিজ্ঞতা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য বিকেন্দ্রীকৃত প্রশিক্ষণ অবকাঠামো গড়ে তোলার একটি কার্যকর মডেল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে ল্যাব-ফেসিলিটি বৃদ্ধি:

বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ খাতের সক্ষমতা ও সেবার মান উন্নয়নে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প” (এলডিডিপি)-এর আওতায় ৬১টি জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতালে ল্যাবরেটরি ও ১৫০টি উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালে

ডায়াগনস্টিক ল্যাব আধুনিকায়ন করেছে। প্রকল্পের অংশ হিসেবে বিভিন্ন পরীক্ষাগারে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে, যা কেবল প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিই নয়, বরং পরীক্ষণ ও রোগনির্ণয় প্রক্রিয়াকে আরও দ্রুত, নির্ভুল, কার্যকর ও ফলপ্রসূ করেছে।

উপজেলা পর্যায়ে প্রাণি-রোগ নির্ণয়ে সহায়ক হিসেবে আন্ড্রাসনোগ্রাম মেশিন সরবরাহ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও ল্যাব স্টাফদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে পরীক্ষাগারসমূহের কার্যক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, একই সঙ্গে মানবসম্পদও দক্ষ ও সক্ষম হয়ে উঠেছে। খামারি ও মাঠকর্মীদের জন্য সময়োপযোগী ও নির্ভুল রোগনির্ণয়ের সুবিধা নিশ্চিত হওয়ায় গবাদিপশুর স্বাস্থ্য রক্ষা, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং প্রাণিসেবার মান উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

ফলে, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ল্যাব-ফেসিলিটি সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন উদ্যোগটি একটি সাফল্যের গল্প হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, যা উন্নয়নশীল দেশে প্রাণিসম্পদ সেবা সম্প্রসারণ, প্রযুক্তি গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা শক্তিশালী করার একটি কার্যকর মডেল হিসেবে অনুকরণীয় হতে পারে।

বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ একটি সময়োপযোগী ও সমন্বিত উদ্যোগ হিসেবে শুরু হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্য হলো কৃষি-ভিত্তিক অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

প্রথমত, দেশের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ও ডায়াগনস্টিক ল্যাবগুলো, যেমন FDIL (Field & Disease Investigation Laboratory) এবং CDIL (Central Disease Investigation Laboratory), আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এ সব ল্যাবে নতুন যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি সংযোজনের মাধ্যমে রোগ নির্ণয়, মান পরীক্ষা এবং উদ্ভাবনী গবেষণা কার্যক্রম দ্রুততার সাথে এবং নির্ভুলভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা চালানোর সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

দ্বিতীয়ত, জেলা পর্যায় প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মোট আটটি উপ-পরিচালক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এসব কেন্দ্র আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত, যা কৃত্রিম প্রজনন, রোগ-নিয়ন্ত্রণ, পশুর স্বাস্থ্য ও প্রজনন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কার্যকর প্রশিক্ষণ প্রদানের সুযোগ তৈরি করেছে। কেন্দ্রগুলোতে জেলা কর্মকর্তা, মাঠকর্মী এবং প্রডিউসার গ্রুপের সদস্যরা নিয়মিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারছেন, যা স্থানীয়

উৎপাদনশীলতা ও প্রজনন দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হচ্ছে।

তৃতীয়ত, বিসিএস লাইভস্টক একাডেমীকে একটি জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর জন্য সার্বিক আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে, যাতে এটি দেশের প্রাণিসম্পদ খাতের জন্য একটি মানসম্পন্ন এবং কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ও গবেষণা হাব হিসেবে কাজ করতে পারে। এখানে উচ্চমানের প্রশিক্ষণ, আন্তর্জাতিক মানের কোর্স এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রম পরিচালিত হবে, যা বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘমেয়াদী টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।

চতুর্থত, প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ নীতি এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতিমালা ও গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নীতিমালা স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষক, প্রডিউসার গ্রুপ এবং বাজার সংযোগকে সুসংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত করতে সহায়তা করছে। এটি দেশের প্রাণিসম্পদ খাতকে একটি সমন্বিত, নিরাপদ এবং বাজারমুখী ব্যবস্থাপনার দিকে পরিচালিত করছে।

এই উদ্যোগগুলো কেবল প্রযুক্তি এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি, দক্ষ জনবল গড়ে তোলা এবং নীতি-নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় প্রমাণভিত্তিক তথ্য ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ স্থাপন করেছে। ফলে, বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ খাতের আধুনিকীকরণকে একটি কেস স্টাডি হিসেবে তুলে ধরা যায়।

হাতের স্পর্শ ছাড়াই আধুনিক মেশিনে স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ মিষ্টি তৈরি

মিষ্টির দোকানে মিষ্টি তৈরির প্রথাগত পদ্ধতি সাধারণত তাজা ছানা বা দুধের ক্ষীর তৈরির ওপর নির্ভরশীল। খাঁটি দুধ ফুটিয়ে লেবুর রস বা ছানা কাটানোর পানি দিয়ে ছানা তৈরি করা হয়, যা পরে ভালোভাবে মখে নরম ডো তৈরি করে বিভিন্ন আকৃতি দিয়ে চিনি বা গুড়ের সিরায় জ্বাল দিয়ে রসে ভেজানো মিষ্টি তৈরি করা হয় যেমন- রসগোল্লা বা সন্দেশ।

প্রথাগত মিষ্টি তৈরি

১. ছানা প্রস্তুতকরণ: টাটকা দুধ ফুটিয়ে তাতে ছানা কাটানোর পানি বা লেবুর রস মিশিয়ে ছানা তৈরি করা হয়। এরপর সুতি কাপড়ে ছেকে ঝুলিয়ে রেখে ছানার পানি ঝরানো হয়।
২. মথানো: ছানাগুলো ভালো করে মখে একদম মিহি ও নরম করে নেওয়া হয়, যাতে মিষ্টির গায়ে ফাটল না ধরে।
৩. আকৃতি দেওয়া: মথানো ছানার সাথে সামান্য ময়দা বা সুজি মিশিয়ে ছোট ছোট গোল বা লম্বা আকার দেওয়া হয়।
৪. সिरা তৈরি ও জ্বাল দেওয়া: চিনি ও পানি ফুটিয়ে পাতলা সিরা তৈরি করা হয়। এরপর ছানার মিষ্টিগুলো ওই ফুটন্ত সিরায় কিছুক্ষণ জ্বাল দেওয়া হয়, যা মিষ্টিকে রসালো করে তোলে।
৫. শুকনো মিষ্টি (সন্দেশ): সন্দেশের ক্ষেত্রে ছানা ও চিনি একসাথে কড়াইতে হালকা আঁচে জ্বাল দিয়ে ঘন করে নিয়ে ছাঁচে ফেলে বা হাতে আকার দিয়ে তৈরি করা হয়। মিষ্টির স্বাদ বাড়াতে এলাচ, জাফরান বা কেওড়া জল ব্যবহার করা হয়। এখানে যে বর্ণনা দেয়া হলো তা সবই হাতে তৈরি করা হয়। কিন্তু প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর আধুনিক মেশিনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ মিষ্টি তৈরির অসাধারণ এক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ পদ্ধতিতে মিষ্টি তৈরিতে হাতের স্পর্শের প্রয়োজনই হবেনা।

আধুনিক মেশিনে স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ মিষ্টিজাত পণ্য তৈরিতে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ মিষ্টিজাত পণ্য তৈরিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো দুগ্ধ খামারীদের উৎপাদিত দুধের সঠিক মূল্য নিশ্চিত করা এবং ভোক্তাদের কাছে মানসম্মত

দুগ্ধজাত পণ্য পৌঁছে দেওয়া। এ জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি বিতরণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত উৎপাদন নিশ্চিতকরণ এবং উদ্যোক্তা তৈরি ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। যেমন:

১. মিল্ক ক্রিম সেপারেশন মেশিন: খামারি বা উদ্যোক্তাদের মাঝে ক্রিম সেপারেশন মেশিন বিতরণ করা হয়েছে, যা দুগ্ধজাত পণ্য যেমন ঘি, ছানা এবং মিষ্টি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। কোভিড ১৯ মহামারির সময় লকডাউনের চলাকালে যখন দুগ্ধ খামারীরা চরম বিপাকে পড়েছিল তখন এলডিডিপি'র মিল্ক ক্রিম সেপারেটর-মেশিন বিতরণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রকল্প এলাকার ৪৬৬ উপজেলায় ১৫০০ মিল্ক ক্রিম সেপারেটর মেশিন বিতরণ করা হয়।
২. মিল্কিং মেশিন: দুগ্ধ উৎপাদনকারী, যাদেরকে প্রডিউসার গ্রুপ (পিজি) বলা হয়, তাদের জন্য ৪২৯১টি মোবাইল মিল্কিং মেশিন সরবরাহ করা হয়েছে, যা সরাসরি খামার পর্যায়ে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে দুধ সংগ্রহ নিশ্চিত করেছে।
৩. স্মল স্কেল ও লার্জ স্কেল মিল্ক প্রসেসিং প্লান্ট স্থাপন: আধুনিক মেশিনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ মিষ্টি তৈরির অসাধারণ ব্যবস্থা এই প্লান্টেই হয়ে থাকে। প্রকল্প এলাকায় ম্যাচিং গ্রান্ট-এর মাধ্যমে স্মল স্কেল ও লার্জ স্কেল মিল্ক প্রসেসিং প্লান্ট স্থাপনের জন্য উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ও প্রকল্পের গ্রান্ট রিভিও কমিটির মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত ১৭৮ জন উদ্যোক্তাকে স্মল স্কেল মিল্ক প্রসেসিং প্লান্ট স্থাপনের জন্য ৪০ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশ হারে অনুদান প্রদান করা হয়। উদ্যোক্তা প্রতি ১২, ৪৫০০০/- (বার লক্ষ পয়তাল্লিশ হাজার টাকা) অনুদান প্রদান করা হয়। এর দ্বারা দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণসহ আধুনিক মিষ্টি তৈরীর মেশিন স্থাপন করা হয়, যা ঘন্টায় ৪০০০-৬০০০ মিষ্টি তৈরীতে সক্ষম। এ সকল প্লান্টে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রায় ৪,২০০ ডেইরি প্রডিউসার গ্রুপের নিকট থেকে তরল দুধ সংগ্রহ করে আধুনিক পদ্ধতিতে হাতের ছোয়া ছাড়া বিভিন্ন প্রকার মিষ্টি তৈরী করা হচ্ছে। লার্জ স্কেল মিল্ক প্রসেসিং প্লান্ট স্থাপনের জন্য ৪০: ৬০ হারে ১৫ জন নির্বাচিত উদ্যোক্তা প্রতি ৮৩,০০,০০০.০০ (তিরিশ লক্ষ টাকা) হারে অনুদান প্রদান করা হয়। লার্জ স্কেল মিল্ক প্রসেসিং প্লান্ট স্থাপনের জন্য যে সকল মেশিন ব্যবহার করা হয় তা হলো দুধ গ্রহণের ট্যাঙ্ক, দুধ পাস্টুরাইজেশন প্ল্যান্ট, দুধ চিলার মেশিন, ক্রিম সেপারেটর, আধুনিক মিষ্টি মেকার, ডিপ ফ্রিজ, দুধের ক্যান, স্বয়ংক্রিয় দুধ বিশ্লেষক, ঘি তৈরির পোটস, ঘি তৈরির মেশিন, দুধ প্যাকেজিং মেশিন, মিষ্টি শোকেস রেফ্রিজারেটর, মিষ্টি তৈরির আনুষঙ্গিক, দই তৈরির প্ল্যান্ট ইত্যাদি।
৪. ভ্যালু চেইন অবকাঠামো: মিষ্টি ও অন্যান্য দুগ্ধজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণের

জন্য আধুনিক স্টোরেজ, প্যাকেজিং এবং কোয়ালিটি কন্ট্রোল সুবিধা সংবলিত অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার করা হয়।

৫. নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত প্রাণীজ পণ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় কয়েক হাজার খামারি ও উদ্যোক্তাকে খাদ্য নিরাপত্তা এবং হাইজিন বজায় রাখার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
৬. মিষ্টি তৈরিতে ব্যবহৃত কাঁচামালের গুণগত মান পরীক্ষার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ল্যাবরেটরিগুলোকে আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে সমৃদ্ধ করা হয়েছে।
৭. উন্নত ডেইরি হাব স্থাপনের মাধ্যমে দুধের প্রাথমিক শীতলীকরণ ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রসেসিং নিশ্চিত করা হচ্ছে, যা সুস্বাদু ও নিরাপদ মিষ্টি তৈরির মূল ভিত্তি।
৮. সারা দেশে মোট ৬,৫০০টি উৎপাদনকারী দল গঠন করা হয়েছে, যারা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মিষ্টির মত উচ্চ মূল্যের পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে সক্ষম হচ্ছে।
৯. মিষ্টি তৈরিতে জড়িত উদ্যোক্তাদের প্রযুক্তিগত এবং ব্যবসায়িক পরামর্শ সেবা প্রদান করা হচ্ছে যাতে তারা বাণিজ্যিকভাবে সফল হতে পারে।

গরুর খামারের বর্জ্য থেকে গ্যাস ও বিদ্যুৎ

বাংলাদেশের দুধ শিল্পের উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প” (LDDP) একটি যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষ করে খামারের বর্জ্য (গোবর ও চোনা) পরিবেশসম্মত উপায়ে ব্যবস্থাপনা করে তা থেকে বায়োগ্যাস এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে খামারিদের স্বাবলম্বী করার ক্ষেত্রে এই প্রকল্পের অবদান অনস্বীকার্য। নিচে এলডিডিপি এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাধ্যমে বর্জ্য থেকে শক্তি উৎপাদনের প্রক্রিয়া ও প্রভাবগুলো তুলে ধরা হলো:

১. বর্জ্য থেকে গ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রক্রিয়া

এলডিডিপি প্রকল্পের আওতায় আধুনিক প্রযুক্তির বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনে খামারিদের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

- বায়োডাইজেস্টার স্থাপন: খামারের গোবর ও মূত্র নির্দিষ্ট অনুপাতে পানির সাথে মিশিয়ে বড় ডাইজেস্টারে পাঠানো হয়। সেখানে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে পচনের ফলে মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হয়।
- বায়োগ্যাস জেনারেটর: উৎপন্ন গ্যাস পাইপের মাধ্যমে রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়। বড় খামারগুলোর ক্ষেত্রে এই গ্যাস দিয়ে বায়োগ্যাস জেনারেটর চালাানো হয়, যা থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়: উৎপাদিত বিদ্যুৎ দিয়ে খামারের ফ্যান, লাইট, মিক্সিং মেশিন এবং চপার মেশিন চালাানো সম্ভব হচ্ছে।

২. এলডিডিপি (LDDP) প্রকল্পের বিশেষ অবদান

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এই প্রকল্পের মাধ্যমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় যে পরিবর্তনগুলো এনেছে:

- ভর্তুকি ও আর্থিক প্রণোদনা: খামারিদের বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগের বিপরীতে প্রকল্প থেকে আর্থিক সহায়তা বা ম্যাচিং গ্রান্ট দেওয়া হয়।
- প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা: খামারিদের শেখানো হচ্ছে কীভাবে বর্জ্যকে "সম্পদে" রূপান্তর করা যায়। পরিবেশ দূষণ রোধে এটি একটি বড় সচেতনতামূলক কাজ।

- জলবায়ু সহনশীল খামার: মিথেন গ্যাস বায়ুমণ্ডলে মিশে গ্রিনহাউস প্রভাব তৈরি করে। এলডিডিপি এই গ্যাসকে জ্বালানিতে রূপান্তরের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষায় কাজ করছে।
- সার উৎপাদন (Slurry): গ্যাস উৎপাদনের পর অবশিষ্ট অংশ বা 'স্মারি' উন্নতমানের জৈব সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যা এলডিডিপি খামারিদের বিক্রয় করতে উৎসাহিত করে।

৩. খামারিদের প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার এই আধুনিকায়নে খামারিরা সরাসরি কয়েকটি উপায়ে লাভবান হচ্ছেন:

সুবিধার ধরণ	বিবরণ
খরচ হ্রাস	এলপিগি গ্যাস বা কাঠের বদলে বায়োগ্যাস দিয়ে রান্নার কাজ চালায় জ্বালানি খরচ সাশ্রয় হয়।
বিদ্যুৎ সাশ্রয়	জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করায় গ্রিড বিদ্যুতের ওপর নির্ভরতা কমে এবং বিল হ্রাস পায়।
অতিরিক্ত আয়	উৎপাদিত জৈব সার (স্মারি) জমিতে ব্যবহার করা যায় অথবা বাজারে বিক্রি করে বাড়তি আয় হয়।
পরিচ্ছন্ন খামার	গোবর যত্রতত্র না ফেলে প্ল্যান্টে দেওয়ায় খামারের পরিবেশ দুর্গন্ধমুক্ত ও রোগজীবাণুমুক্ত থাকে।

৪. ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও টেকসই উন্নয়ন

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের লক্ষ্য হলো প্রতিটি বড় বাণিজ্যিক খামারকে একটি করে 'এনার্জি হাব' হিসেবে গড়ে তোলা। এতে করে:

- জাতীয় গ্রিডের ওপর চাপ কমবে।
- রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা করা যাবে।
- খামারিদের নিট মুনাফা (Net Profit) বৃদ্ধি পাবে।

সারসংক্ষেপ: এলডিডিপি প্রকল্পের মাধ্যমে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেবল পরিবেশ রক্ষা করছে না, বরং খামারিদের জ্বালানি ও সারের চাহিদা মিটিয়ে ডেইরি সেক্টরকে একটি লাভজনক শিল্পে পরিণত করছে।

নিরাপদ খাদ্য হিসাবে দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্য উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড

সুখম খাদ্য হিসাবে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, মান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ, বাজারজাতকরণ এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০২৩ দ্বারা এই বোর্ড গঠন করা হয়েছে। ডেইরি খাতের উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প” ডেইরি খাতের অংশীজনদের সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

১. নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বোর্ডের একটি পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হবে, যথা:-
২. মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, যিনি এর চেয়ারম্যানও হবেন;
৩. প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, যদি থাকে, যিনি এর কো-চেয়ারম্যানও হবেন;
৪. জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত একজন সংসদ-সদস্য;
৫. সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, যিনি এর ভাইস-চেয়ারম্যানও হবেন;
৬. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ;
৭. অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অনূ্যন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;
৮. স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অনূ্যন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;
৯. কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অনূ্যন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;
১০. বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অনূ্যন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;
১১. শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অনূ্যন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;
১২. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অনূ্যন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;
১৩. মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর;
১৪. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট;
১৫. সরকার কর্তৃক মনোনীত কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেইরি বিজ্ঞান বিভাগের একজন অধ্যাপক;
১৬. সরকার কর্তৃক মনোনীত নিবন্ধিত দুগ্ধ সমবায় সমিতিসমূহের মধ্য হতে একজন করে মোট ২ (দুই) জন সদস্য যাদের মধ্যে অনূ্যন ১ (এক) জন

মহিলা হবেন;

১৭. সরকার কর্তৃক মনোনীত গবাদিপশু পালনকারী, বাণিজ্যিকভাবে দুধ উৎপাদনকারী ও দুগ্ধজাত পণ্যের ব্যবসায়ীগণের মধ্য হতে ২ (দুই) জন প্রতিনিধি যাহাদের মধ্যে অনূন্য ১ (এক) জন মহিলা হবেন, তবে কোনো শ্রেণি বা সংগঠন হতে একাধিক সদস্য মনোনয়ন দেয়া যাবে না; এবং

১৮. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড, যিনি এর সদস্য-সচিবও হবেন।

প্রতি বৎসরে পরিচালনা পর্ষদের অনূন্য ২ (দুই) টি সভা অনুষ্ঠিত হবে, তবে জরুরি প্রয়োজনে যে কোনো সময় সভা আহ্বান করা যাবে।

বোর্ডের কার্যাবলি। বোর্ডের কার্যাবলি হবে নিম্নরূপ, যথা:-

১. বাণিজ্যিকভাবে ডেইরি খামার স্থাপন, উন্নত ব্যবস্থাপনা এবং নিরাপদ খাদ্য হিসাবে দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনের পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ;
২. দুগ্ধ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, শীতলীকরণ এবং দুগ্ধজাত পণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপনে তালিকাভুক্তি প্রদান;
৩. ডেইরি সংক্রান্ত বিষয়ে বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদানের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান;
৪. ডেইরি স্বাস্থ্য, দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ বা অনুরূপ বিষয়ে প্রচারণা ও প্রণোদনা প্রদান;
৫. দুগ্ধ খামার বা দুগ্ধ শিল্পাঞ্চল সৃষ্টিতে উদ্যোগ গ্রহণ, দুধ উৎপাদনে উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং সমবায় ভিত্তিতে খামার স্থাপনের উৎসাহ ও পরিবেশ সৃষ্টি;
৬. সমবায় পর্যায়ে দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঋণ প্রদান ও আদায় এবং এতদবিষয়ে সমবায়ভিত্তিক উদ্যোগে সহায়তা প্রদান;
৭. দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার সৃষ্টি, অবকাঠামো তৈরি ও ব্যবস্থাপনা;
৮. নিরাপদ খাদ্য হিসাবে দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্যের শ্রেণিভিত্তিক মান নির্ধারণ, মান যাচাইয়ের জন্য নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা, পরিদর্শন এবং মান নিয়ন্ত্রণ বা নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
৯. সরকার কর্তৃক স্বীকৃত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির মাধ্যমে দুধ উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকারী উদ্যোক্তাদের পুঁজি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;
১০. দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্যের উপর বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহ, গ্রহণা এবং সরকারের নিকট প্রতিবেদন আকারে প্রেরণ;

১১. দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন সংশ্লিষ্ট খামার ও শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন, পরিচালনা ও বাস্তবায়ন;

১২. ডেইরি বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, উৎসাহ, প্রণোদনা ও সহায়তা প্রদান; এবং

১৩. সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য কোনো দায়িত্ব বা নির্দেশনা পালন।

নির্বাহী পরিচালক। (১) বোর্ডের একজন নির্বাহী পরিচালক থাকবেন, যিনি অনূ্যন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা হবেন এবং তিনি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে নিযুক্ত হবেন। নির্বাহী পরিচালক বোর্ডের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হবেন এবং প্রধান নির্বাহী হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০২৩ এ উল্লিখিত কার্যাবলিসহ সরকার ও পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক, সময় সময়, অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

দুগ্ধ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, শীতলীকরণ ও দুগ্ধজাত পণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানকে বোর্ডের নিকট তালিকাভুক্ত হওয়া; দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্যের মান নির্ধারণ, নিয়ন্ত্রণ; দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদনস্থল, মজুদাগার, প্রক্রিয়াকরণ কারখানা ও বাজার পরিদর্শন; দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্যের নমুনা সংগ্রহ; বোর্ডের তহবিল; বার্ষিক বাজেট; হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা; বার্ষিক প্রতিবেদন; প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ; বিধি প্রণয়ন; প্রবিধান প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে আইনে বিস্তারিত বিধান রয়েছে।

[বিস্তারিত জানার জন্য সোমবার, নভেম্বর ১৩, ২০২৩ এ বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত ২০২৩ সনের ৪৬ নং আইন, বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০২৩ পড়া যেতে পারে।]

দুধ উৎপাদনকারীদের সমবায় শক্তি টেকসই অর্থনৈতিক একটি উদ্যোগ

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক দুগ্ধ খামারীদের অর্থনৈতিক ভিত্তি দীর্ঘদিন ধরেই ছিল নড়বড়ে অসংগঠিত উৎপাদন, মধ্যস্বত্বভোগীর দৌরাভ্য, বাজারে দর-কষাকষির সীমিত ক্ষমতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়নে প্রবেশাধিকারের সুযোগ না থাকা তাদের অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করছিল। এই বাস্তবতায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর-এর বাস্তবায়নে এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়-এর আওতায় পরিচালিত “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প” এলডিডিপি একটি কাঠামোগত ও টেকসই সমাধানের পথ দেখিয়েছে, উৎপাদকদের সংগঠিত করে সমবায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক শক্তি গড়ে তোলার মাধ্যমে।

সংগঠিত শক্তির ভিত্তি: ৬,৫০০ প্রডিউসার গ্রুপ

দেশের ৪৬৬টি উপজেলায় আটটি ভ্যালু চেইনভিত্তিক মোট ৬,৫০০টি প্রডিউসার গ্রুপ (PG) গঠন করা হয়েছে। এতে সরাসরি সম্পৃক্ত ২,৪২,৫৮৩ জন খামারি; তাদের মধ্যে ৫৫.৫২% নারী, যা গ্রামীণ অর্থনীতিতে নারীর নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। কেবল দুগ্ধ ভ্যালু চেইনেই ৪,২৬৫টি ডেইরি পিজি গঠিত হয়েছে; প্রতিটি গ্রুপে গড়ে ৪০ জন সদস্য।

শুরুর পর্যায়ে জাতিসংঘের Food and Agriculture Organization (FAO) প্রণীত ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত গাইডলাইনের ভিত্তিতে সদস্য নির্বাচন ও গ্রুপ গঠন করা হয়। লক্ষ্য ছিল, ভ্যালু চেইনভিত্তিক সংগঠন, জলবায়ু-সহিষ্ণু প্রযুক্তি গ্রহণ, বাজার সংযোগ, ব্যবসা পরিকল্পনা এবং আন্তঃপিজি বাণিজ্যিক সম্পর্ক সম্প্রসারণ।

সক্ষমতা থেকে স্বল্পঃ টেকসই ব্যবসায় রূপান্তর

নিয়মিত সভা, স্বল্প ও তহবিল গঠন, স্বচ্ছ হিসাবরক্ষণ, এসব চর্চা পিজিগুলোর সাংগঠনিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করেছে। ফার্মার্স ফিল্ড স্কুল (FFS)-এর মাধ্যমে সদস্যরা উৎপাদন প্রযুক্তি, ব্যবসা পরিকল্পনা, পণ্য বহুমুখীকরণ ও বিপণনে হাতে-কলমে দক্ষতা অর্জন করেছেন। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি, মানোন্নয়ন, এবং বিনিয়োগ ক্ষমতার সম্প্রসারণ হয়েছে।

প্রকল্পের লিংকেজ মডেলের মাধ্যমে পিজিগুলো পশ্চাৎমুখী সংযোগ (ইনপুট, ভেট সার্ভিস, ফিড) ও অগ্রবর্তী সংযোগ (প্রসেসর, ক্রেতা, রিটেইলার) প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলেছে। এতে কার্যক্রম টেকসই ব্যবসায় রূপ নিয়েছে

এবং বাজারে দর-কষাকষির ক্ষমতা বেড়েছে।

আইনি স্বীকৃতির পথে: উৎপাদনমুখী সমবায়

অসংগঠিত গোষ্ঠীর একটি বড় সীমাবদ্ধতা হলো আইনি কাঠামোর বাইরে থাকা ফলে সরকারি সহায়তা, অনুদান, ব্যাংকিং ও বীমা সুবিধায় প্রবেশ কঠিন ছিল। এই বাধা দূর করতে সমবায় অধিদপ্তর-এর নির্দেশনার আলোকে পিজিগুলোকে উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি হিসেবে নিবন্ধনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, যা সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০২০) এবং বাংলাদেশ সমবায় আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩)-এর বিধানসম্মত।

উৎপাদনমুখী সমবায়ের মূল বৈশিষ্ট্য হলো যৌথ কাঁচামাল ক্রয়, সম্মিলিত উৎপাদন ও বিপণন, মান নিয়ন্ত্রণ এবং লাভের ন্যায্য বন্টন। কমপক্ষে ২০ জন সমমনা ব্যক্তি একত্রিত হয়ে এ ধরনের সমবায় সমিতি গঠন করতে পারেন। আইনি স্বীকৃতি পাওয়ার ফলে পিজিগুলো এখন:

- সরকারি প্রকল্প, ভর্তুকি ও প্রণোদনায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারছে;
- চুক্তিভিত্তিক কৃষি (Contract Farming) ও বাজার চুক্তিতে প্রবেশ করছে;
- আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করছে;
- ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক স্থাপন করছে;
- দলগত দর-কষাকষির ক্ষমতা বাড়িয়ে ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করছে।

পরিবর্তনের গল্প: খামারি থেকে উদ্যোক্তা

সমবায়ভিত্তিক কাঠামো দুধ উৎপাদকদের ‘খামারি’ থেকে ‘উদ্যোক্তা’র রূপান্তরের পথ তৈরি করেছে। সংগঠিত সঞ্চয় ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি তাদের বিনিয়োগ সক্ষমতা বাড়িয়েছে; মানসম্মত প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে বাজারে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান গড়ে উঠেছে। মধ্যস্বত্বভোগীর নির্ভরতা কমে এসেছে, এবং মূল্য শৃঙ্খলে উৎপাদকের অংশীদারিত্ব বেড়েছে।

বৈশ্বিক প্রাসঙ্গিকতা

ক্ষুদ্র উৎপাদক-প্রধান অর্থনীতির দেশগুলোর জন্য এটি একটি মডেল হতে পারে এবং এই রূপান্তর কাঠামোটি অনুসরণ করা যেতে পারে, যেখানে সংগঠন, সক্ষমতা, আইনি স্বীকৃতি ও বাজার সংযোগ একত্রে কাজ করে। বাংলাদেশে দুধ ও দুধপণ্য উৎপাদনকারীদের সমবায়ভিত্তিক সংগঠিতকরণ দেখিয়েছে, কীভাবে নীতি-সমর্থিত উদ্যোগ গ্রামীণ জীবিকা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তাকে একইসঙ্গে শক্তিশালী করতে পারে।

পরিবেশবান্ধব ও জলবায়ু-সহনশীল টেকসই বাজার ব্যবস্থাপনা

নিরাপদ খাদ্য এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বাংলাদেশে পরিবেশবান্ধব এবং জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামো সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই এবং সময়োপযোগী বাজার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা খুবই জরুরী। আমাদের দেশে সকল উপজেলা এবং অধিকাংশ ইউনিয়ন পর্যায়ে কাঁচা বাজার রয়েছে। যেখানে মাছ মাংস দুধ ডিম শাক সবজি কাপড় চোপড় গৃহস্থালী সামগ্রী কেনাবেচা করা হয়। অধিকাংশ বাজার অপরিষ্কার, অস্বাস্থ্যকর এবং দূর্বল নর্দমা ব্যবস্থার কারণে ব্যবহার উপযোগী নয়।

অনেক বাজারে পর্যাপ্ত টয়লেট সুবিধার অভাব রয়েছে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করে। বিদ্যমান বাজার ব্যবস্থার অধিকাংশই জনস্বাস্থ্যের জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প”(এলডিডিপি)র আওতায় দেশের বিভিন্ন উপজেলার ১৩৫টি কাঁচা বাজার (Wet Market)- নির্মাণ বা আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১৩৫ বাজারের মধ্যে ১০২টি নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৯২টি বাজার যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। হস্তান্তরের মাধ্যমে বাজারগুলি ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে।

কাঁচা বাজারের দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম নিশ্চিত করতে কার্যকরী নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। নির্দেশিকায় হস্তান্তর, বাজার পরিচালনা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, দোকান বরাদ্দ, রাজস্ব সংগ্রহ এবং অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি দোকানদারদের ন্যায্য বরাদ্দ, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চয়তা প্রদান করছে।

এর ফলে এলডিডিপি'র -এর মাধ্যমে নির্মিত কাঁচা বাজারগুলো কেবল মাছ, মাংস, ডিম ও অন্যান্য কৃষিপণ্য বিক্রির জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করেনি, বরং স্থানীয় অর্থনীতি, কর্মসংস্থান, ব্যবসায়িক ধারাবাহিকতা এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

প্রাণীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষার নয়া দিগন্ত প্রাণিসম্পদ বীমা

বাংলাদেশে কৃষি খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপখাত প্রাণিসম্পদ, যা লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র খামারির জীবিকায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে আসছে। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, নারীর ক্ষমতায়ন, আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনে এই খাতটির ভূমিকা অপরিসীম। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী প্রায় ৫১.৩৩ শতাংশ পরিবার কৃষিকাজে নিয়োজিত।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও প্রাণিসম্পদ খাত নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ সরবরাহের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের অবদান ব্যাপক ও বহুমুখী। দেশের প্রায় ২০ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ এবং ৫০ শতাংশ মানুষ পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদের উপর নির্ভরশীল। দেশের মোট জিডিপিতে শতকরা ১.৮০ ভাগ এবং কৃষিজ জিডিপিতে ১৬.৩৩ ভাগ প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান। প্রাণিসম্পদ খাত বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশ্বব্যাপী গবাদি পশুর বীমার আকার প্রায় ৪.১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যার বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার শতকরা ৭.৫৩ ভাগ। ফলে বাংলাদেশের গবাদিপশুর আর্থিক ক্ষতি থেকে রক্ষার প্রয়োজনে প্রাণিসম্পদ বীমা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে গবাদিপশুর সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিবেশী যে কোনও দেশের তুলনায় দেশে গবাদিপশুর ঘনত্ব বেশি। পাশাপাশি বাংলাদেশে পোল্ট্রি শিল্প একটি দ্রুত বিকাশমান খাত, যা বছরে প্রায় ৬০ লক্ষাধিক খামারির জীবন-জীবিকার উৎস। বিগত কয়েক দশকে দেশে মাংস, দুধ, ডিমের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে জনপ্রতি প্রতিদিন মাংস ও দুধের প্রাপ্যতা যথাক্রমে ১৪৪ গ্রাম ও ২৩৪ মিলি এবং ডিমের প্রাপ্যতা জনপ্রতি বছরে ১৩৫টি। তবে, দেশের গবাদিপশু পালন খাত বিভিন্ন রোগ-ব্যাদি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্বল বাজার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ঝুঁকির কারণে প্রায়শঃই খামারিগণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

উন্নত বিশ্বের অধিকাংশ দেশে সুসংগঠিত প্রাণিসম্পদ বীমা ব্যবস্থা গড়ে উঠছে। কিন্তু মধ্যম ও নিম্ন আয়ের দেশগুলোর মাত্র এক-তৃতীয়াংশ এই ধরনের পরিষেবা প্রদান করে। বাংলাদেশে অধিকাংশ খামারিই প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি। তাঁরা ইনটেনসিভ অথবা সেমি-ইনটেনসিভ পদ্ধতিতে গবাদিপশু পালন করে থাকে। নেপাল, ফিলিপাইন, ভারত, পেরু, ব্রাজিলসহ বিশ্বের অনেক দেশে প্রাণিসম্পদ

বীমা ব্যবস্থা বিদ্যমান। সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ১৯৮১ সালে এ দেশে প্রথম গবাদিপশু বীমা কার্যক্রম শুরু করে। কিন্তু বিবিধ কারণে গবাদিপশু বীমা কার্যক্রম কাজিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়।

ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় বেসরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে প্রথম ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ১৯৮৮ সালে দেশের প্রান্তিক খামারিদের গবাদিপশু বীমা কর্মসূচি চালু করে। পরবর্তীতে, ব্র্যাক, গ্রামীণ কল্যাণ, আশা, প্রশিকা, সাজেদা ফাউন্ডেশনের মতো কিছু এনজিও তাদের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় গবাদিপশু বীমা পরিষেবা চালু করে। বাংলাদেশ সরকারের অধীনে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ২০১৩ সাল থেকে ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে গরু হুটপুটকরণের জন্য গবাদিপশুর বীমা ব্যবস্থা চালু করে, যা ঋণের কিস্তির সাথে সমন্বয় করা হয়।

রোগের প্রাদুর্ভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অস্থিতিশীল বাজার ব্যবস্থাপনা, চুরি, ডাকাতি বা দুর্ঘটনা প্রাণিসম্পদ খাতকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। গবাদিপশু বীমা এই ঝুঁকিগুলোর ক্ষেত্রে আর্থিক সুরক্ষা প্রদান করে। গবাদিপশুর এই ঝুঁকিগুলি নিরসন এবং প্রাণিসম্পদ খাতের টেকসই উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সহযোগিতায় একটি জাতীয় প্রাণিসম্পদ বীমা নীতিমালা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং খাদ্য নিরাপত্তার প্রসারে প্রাণিসম্পদ বীমা একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক শক্তি। এই নীতিমালার লক্ষ্য হল খামারিদের আর্থিক ক্ষতি হতে সুরক্ষা প্রদান ও প্রাণিসম্পদ খাতের টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। ইতোমধ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় প্রাণিসম্পদ বীমা নীতিমালার খসড়া প্রস্তুত করে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

জাতীয় বীমা নীতিমালার লক্ষ্য

জাতীয় বীমা নীতিমালার লক্ষ্য হল খামারিদের গবাদিপশুর মৃত্যু, রোগ বা দুর্ঘটনার কারণে আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে নিম্নরূপভাবে সুরক্ষা প্রদান করা:

১. গবাদিপ্রাণির মৃত্যু বা ক্ষতিজনিত অর্থনৈতিক ক্ষতি থেকে খামার মালিকদের সুরক্ষা;
২. গবাদিপশু ও পোল্ট্রি পালনের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলো প্রশমনের মাধ্যমে টেকসই প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ধারাবাহিকতায় সহায়তা করা;
৩. আর্থিক ঝুঁকি হ্রাস করে প্রাণিসম্পদ খাতে বিনিয়োগ ও উদ্যোক্তাগণকে উৎসাহিত করা;
৪. প্রাণিসম্পদ বীমা কোম্পানি/সংস্থার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান;

| প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প : সফলতার গল্প

৫. প্রাণিসম্পদ বীমা ব্যবস্থার সম্প্রসারণে রেগুলেটরি সহায়তা প্রদান।

নীতিমালা বাস্তবায়নে সরকারি উদ্যোগ

প্রাণিসম্পদ বীমা নীতি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১. প্রাণিসম্পদ বীমা প্রচলনের ক্ষেত্রে সকল প্রান্তিক খামারি, বানিজ্যিক খামারি এবং বীমা সংস্থাগুলোকে উৎসাহিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
২. প্রত্যেকটি বাণিজ্যিক খামারকে এই নীতির আওতায় আনার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রচারণার বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।
৩. প্রাণিসম্পদ বীমা বাস্তবায়নের জন্য বীমা আইন অনুসরণপূর্বক আর্থিক, কারিগরী জনবলসহ সার্বিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের সংস্থান করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক জাতীয় প্রাণিসম্পদ নীতিমালা অনুমোদিত হওয়ার পর এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে নারী এবং নারীর উন্নয়নে প্রাণীসম্পদ

নারীর ক্ষমতায়ন

নারীর ক্ষমতায়ন হলো নারীদের নিজস্ব জীবনের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্জন এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার একটি প্রক্রিয়া। এটি আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি, সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং পরিবার ও সমাজে নারীদের প্রতি বৈষম্য দূর করে। শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হলো নারীর ক্ষমতায়নের মূল ভিত্তি। বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সরকার অবৈতনিক শিক্ষা, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে নারীদের অংশগ্রহণ এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অংশ হিসেবে ফ্যামিলি কার্ড প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। নারীর ক্ষমতায়ন শুধু নারীর অধিকারই নয়, বরং এটি সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র হ্রাস এবং একটি টেকসই ও সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনে অপরিহার্য।

নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প”

বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ খাত বিশেষত “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প” প্রাণী পালন, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন এবং বিপণন, প্রাণীর মান উন্নয়ন, দেশীয় জাত সংরক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীকে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করেছে। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের সকল কর্মকাণ্ডে জেডারভিত্তিক অসমতা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে “সোশ্যাল ও জেডার উন্নয়ন” বিষয়ে বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল, যার ফলে সকল ক্ষেত্রে জেডার সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রাণিসম্পদ উৎপাদনে জড়িত নারী-পুরুষের বৈষম্য হ্রাস পেয়েছে। সে সাথে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ঝুঁকি কমানোর ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রকল্পটির প্রাণিসম্পদ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নারীদের সক্রিয় অন্তর্ভুক্তি রয়েছে এবং নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি প্রাণিসম্পদ উৎপাদনের সকল কাজে জড়িত নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যে দুর্বলতা রয়েছে তা কমিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। এর ফলে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর সমান অংশগ্রহণের ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি

উন্নয়ন প্রকল্পে মোট সুফলভোগীর ৫০% নারী সদস্য রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এর মধ্যে থাকবে নারী উদ্যোক্তা, দুগ্ধ উৎপাদক দল ও কৃষক মাঠ স্কুল দল, গরু হস্টপুস্টকরণকারী, সোনালী মুরগি পালনকারী, ছাগল ও ভেড়া পালনকারী এবং দেশি মুরগি পালনকারী। এছাড়াও প্রকল্পের সকল কার্যক্রমে অনগ্রসর যুবসমাজ, অবহেলিত জনগোষ্ঠী ও ভিন্নভাবে সক্ষম মানুষ বা প্রতিবন্ধীদের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এ প্রকল্পের কার্যক্রমে জেডার সমতা বিধানে যে বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল তা হলো প্রাণিসম্পদে নারীর মালিকানা, ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকার, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, বাজারে প্রবেশাধিকার, সেবা, প্রযুক্তি ও আর্থিক সুবিধাদিতে যুক্তিসঙ্গত প্রবেশাধিকার; কমিউনিটিতে অন্তর্ভুক্তি, প্রডিউসার গ্রুপে অংশগ্রহণ এবং সকল কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা অর্জন; আইনগত-কারিগরি-আর্থিক সহায়তা এবং প্রণোদনা সহায়তা ইত্যাদি সমভাবে প্রাপ্তির সুযোগের নিশ্চয়তা। এ বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্পের সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, ভূমিকা ও সামাজিক কাজে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

নারীবান্ধব সুবিধাদি প্রদান কার্যক্রম

জেডার মূলধারার পাশাপাশি জেডারভিত্তিক সহিংসতার ঝুঁকি কমানোর ব্যবস্থা, নারীবান্ধব সুবিধাদি প্রদান, প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিবর্গ, কর্মী, শ্রমিক এবং সর্বোপরিসকলের জন্য কর্মোপযোগী পরিবেশ তৈরির নিশ্চয়তা প্রদানে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট শুরু থেকেই বদ্ধপরিকর ছিল। প্রকল্পের সকল কার্যক্রমে নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে।

এ সকল কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। যেমন-

১. প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম কতগুলো উপাদানে বিভক্ত করা হয়। এসব কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নানারকম ভ্যালু চেইনের সাথে সম্পৃক্ত ছোট বড় খামারি, প্রডিউসার গ্রুপ, ব্যবসায়ী, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং প্রকল্পের কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারী সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়কে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেয়া হয়।
২. উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও সৃজনশীল কার্যক্রম বাস্তবায়ন উপাদানের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো প্রডিউসার গ্রুপ বা উৎপাদনকারী দল। প্রডিউসার গ্রুপ বা পিজি গঠনের উদ্দেশ্য হলো গ্রুপভিত্তিক খামারিদের সুসংগঠিত করে ওষুধ, ভ্যাকসিন, যন্ত্রপাতি প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান সহ ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি এবং উৎপাদনকারী

ও ভোক্তার মধ্যকার সম্পর্ক জোরদার করা।

৩. প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অন্যতম সাফল্য হলো প্রডিউসার গ্রুপ বা পিজি-তে নারী সদস্যদের ব্যাপক অংশগ্রহণ। মোট সদস্য ২,৪২,৫৮৩ জনের মধ্যে ১,৩৪,৬৭৬ জন তথা ৫৫.৫২ শতাংশ নারী, যা গ্রামীণ অর্থনীতিতে নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিফলন ঘটায়। শতভাগ নারী অংশগ্রহণ রয়েছে ছাগল, ভেড়া, হাঁস, স্ক্যাভেন্জিং মুরগি এবং কোয়েল পালনে। এছাড়াও ৭৭% পায়রা প্রোডিউসার গ্রুপ এবং প্রায় ৫০% দুগ্ধ প্রোডিউসার গ্রুপে নারীর অংশগ্রহণ রয়েছে।

৪. প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মকর্তা, মাঠকর্মী এবং খামারিরা গবাদি পশু পালনের উন্নত প্রযুক্তি, আধুনিক সম্প্রসারণ পদ্ধতি এবং দুগ্ধ উৎপাদনের সর্বোত্তম অনুশীলন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। এটি খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সরাসরি সহায়তা করে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলো নারী খামারিদের প্রয়োজনীয় কলা-কৌশল ও বাস্তব জ্ঞানে খামারি হিসেবে দক্ষ করে তোলে। এর ফলে গবাদি পশু উন্নয়নের প্রতিটি স্তরে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় এবং লিঙ্গ বৈষম্য দূর হয়। এই কার্যক্রমের আওতায় জেডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে বিভিন্ন মেয়াদে মোট ২২৫,৮৫৭ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন, যার মধ্যে ১৩৬,২০৮ জন তথা ৬১ শতাংশই নারী। কৃষক প্রশিক্ষণের আওতায় ৪৭২১৭৯ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ২১১৬৮৯ জন তথা ৪৪.৮ শতাংশই নারী। খামার ব্যবস্থাপনায় ৩৫১৮১৩ জন অংশগ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে ১০১২৭৭ জন তথা ২৮.৭৮ শতাংশ নারী। ২৭ জন নারী প্রাণী প্রজনন, জাত উন্নয়ন কৃত্রিম প্রজনন; খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাণিজ পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ; প্রাণী স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থাপনা এবং প্রাণী পুষ্টির উপর এক মাসব্যাপী বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। পশুপালনে এবং প্রশিক্ষণে নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে নারী অবদান এবং নারী উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান নির্দেশ করে।

৫. দেশের বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত কোম্পানির সাথে প্রোডাক্টিভ পার্টনারশিপ স্থাপন করে দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার সংযোগ সৃষ্টি করে পণ্যকে ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছানো, দুধ ও মাংসের কাঁচাবাজার উন্নয়নে আধুনিক পশু জবাইখানা স্থাপন, দুগ্ধ শীতলীকরণ ইউনিট স্থাপন, সেবা সহজীকরণ এবং নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে ভোক্তা পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির সাথে প্রোডাক্টিভ পার্টনারশিপ

গঠন করে প্রডিউসার গ্রুপগুলোকে সফল ও সক্ষম উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে।

৬. ম্যাচিং গ্রান্টের আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ পশুপালন খাতের আধুনিকায়নে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। প্রকল্পের মোট ৪০৮টি বিশেষায়িত স্থাপনার মধ্যে ৫৪ জন নারী উদ্যোক্তা সরাসরি সম্পৃক্ত হয়ে নিজেদের ব্যবসায়িক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছেন। বিশেষ করে ছোট আকারের দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্রাণীর খাবার ‘টোটাল মিক্সড রেশন’ উৎপাদন এবং ‘রাফেজ বেইলিং’য়ের মতো প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ গ্রামীণ অর্থনীতিতে তাদের নেতৃত্বের অবস্থানকে শক্তিশালী করেছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে নারীরা কেবল উৎপাদক হিসেবেই নয়, বরং আধুনিক ডেইরি হাব ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার দক্ষ ব্যবস্থাপক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছেন, আরও অনেক নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছেন, যা জাতীয় পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করেছে।

৭. ক্লাইমেট স্মার্ট বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনে নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ব্যবস্থাপনায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। মোট ৪৬টি বিশেষায়িত বায়োগ্যাস প্লান্টের মধ্যে ৮ জন নারী উদ্যোক্তা সরাসরি সম্পৃক্ত হয়ে জলবায়ু সহনশীল প্রযুক্তি ব্যবহারে তাদের সক্ষমতা প্রমাণ করেছেন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে নারীরা কেবল গৃহস্থালি জ্বালানি সাশ্রয়ই করছেন না, বরং গবাদি পশুর বর্জ্যকে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে নবায়নযোগ্য শক্তিতে রূপান্তর করে টেকসই কৃষি ও পরিবেশ রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন।

৮. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু সহিষ্ণু উৎপাদন পদ্ধতি উন্নয়নে জেলা ভেটেরিনারি হাসপিটাল, ফিল্ড ভিজিট ইনভেস্টিগেশন ল্যাবরেটরিসমূহের মান উন্নয়নের যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রমে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে ১৫০ টি ভেটেরিনারি হাসপাতালে মিনি ডায়াগনস্টিক যন্ত্রপাতি রয়েছে যেখানে নারী স্টাফ কাজ করছে। কৃত্রিম প্রজনন সেন্টার এবং উন্নত ডায়াগনস্টিক সুবিধার প্রসারে নারীর গবাদি পশু পালন আরও নিরাপদ ও ঝুঁকিহীন হয়ে উঠেছে। এই আধুনিক প্রযুক্তিগত সহায়তাগুলো নারী খামারিদের উৎপাদিত পণ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা করে সাহসিকতার সাথে লড়াই করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করেছেন এবং স্বাবলম্বী হয়েছেন।

সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে নারীর সম্পৃক্ততা বেড়েছে। প্রাণিসম্পদ উৎপাদন, প্রাণী খাদ্য তৈরি, ইনোভেশন, পণ্য বহুমুখীকরণ, বাজারজাতকরণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি নানা কাজে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে, বেড়েছে তাদের আত্মবিশ্বাস, তারা স্বাবলম্বী হয়েছেন। তাদের সন্তানরা ভাল খাবার পাচ্ছে, ভাল শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। তাদের জীবনমান উন্নত হয়েছে। এ সব সম্ভব হয়েছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প”এর মাধ্যমে। উন্নয়ন সহযোগী আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় পরিচালিত এই প্রকল্প বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে এবং বাংলাদেশের প্রান্তিক নারীগণকে এ খাতের সাথে সফলভাবে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে প্রডিউসার গ্রুপ বা পিজি সদস্য ১,৩৪,৬৭৬ জন সক্রিয় রয়েছেন, যা মোট পিজি সদস্যের ৫৫.৫২ শতাংশ। এখন নারীগণ নিজেরাই প্রডিউসার গ্রুপ বা পিজি সদস্য হিসেবে কার্যক্রম অব্যাহত রেখে গ্রামীণ অর্থনীতিকে গতিশীল করতে সক্ষম হবেন।

**সাফল্যের
গল্পকথা**

দুধওয়ালা: স্বপ্নবাজ তিন তরুণের স্বপ্ন আর সাফল্য

স্বপ্ন দেখা যেভাবে শুরু সিলেট শহরের প্রতিষ্ঠান দুধওয়ালা ফুড প্রডাক্টস। এ প্রতিষ্ঠানটির পুরাটা জুড়েই রয়েছে তিনজনের অকৃত্রিম বন্ধুত্বের গল্প। সেই গল্পের শুরুটা হয়েছিল অসীম সাহস আর বন্ধুত্বের বন্ধন। সিলেট শহরে দুধওয়ালা চিনেন না এমন মানুষ খুব কমই আছে। এই তিন বন্ধু দিরাই উপজেলার আমজাদ হোসেন বিয়ানীবাজারের শাকিল জামান আর সুনামগঞ্জের মোতাহার হোসেন তারা তিনজন সিলেটে আসেন লেখাপড়ার জন্য, একসাথে পড়ার সময় তাদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। একসাথে থাকে আর অবসর সময়ে তারা আলাপ করে ছাত্রজীবন শেষে তারা কি করবে, চাকরি করবে না ব্যবসা করবে। তারপর একসময় তাদের পড়ালেখা শেষ হল। তারুণ্যের উন্মাদনায় একটি খামার করার সিদ্ধান্ত নিলেন এই তিন বন্ধু। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে আর পিছন ফিরে তাকাতে হবে না। পড়ালেখা শেষ করার পর তারা চাকরীর পিছনে না ঘুরে নিজেরাই একটি দুধের খামার গড়ে তোলেন। তিনজনই প্রচণ্ড শ্রম প্রদান করে নিষ্ঠার সাথে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি করেন। কিন্তু দুধ বিক্রি করতে গিয়ে নানা সমস্যায় পড়েন। যেসকল দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে দুধ বিক্রি করতেন, তারা বিভিন্ন অজুহাতে দুধের দাম কম দিতেন এমনকি দুধের মূল্য পরিশোধ করতেন না, কিছু টাকা বাকী রেখে দিতেন যাতে সবসময় তাদের নির্ধারিত মূল্যে খামারিরা ঐ প্রতিষ্ঠানের কাছে দুধ সরবরাহ করেন। এতে করে তারা তিনজন সহ সকল খামারি দুধের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হতে থাকেন। একদিন তারা তিনজন হতাশা থেকে রাগ করে তাদের খামারের উৎপাদিত দুধ ঐ দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি না করে সরাসরি ভোক্তা পর্যায়ে খুচরা বিক্রি শুরু করেন।

হতাশা থেকে পুনরায় যাত্রা

২০১৭ সালে ৩ জন তরুণ উদ্যোক্তা নিজেদের খামারে উৎপাদিত দুধ হোম ডেলিভারি করা শুরু করেন। বাড়ি বাড়ি বিক্রি করার মাধ্যমে তারা আত্মপ্রকাশ করেন। মানুষের দরজার কাছে নিজেদের পণ্য পৌঁছানো তাদের জন্য চ্যালেঞ্জ এবং সেই সাথে কষ্টকর ছিল কিন্তু এই পরিশ্রমের ফলে দ্রুত মানুষের কাছে তারা আস্থা অর্জন করতে পেরেছিল যা তাদের কে একটি ব্রান্ড নামে পরিচিত করে তুলে এবং সবাই তাদেরকে চিনতে শুরু করে। পরবর্তীতে ২০১৯ সালে বগুড়া থেকে কারিগর এনে দই উৎপাদন করা শুরু করে। ২০১৯ সালের শেষ সময়ে এবং ২০২০ সালের প্রথম অর্ধ কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে আবার ধাক্কা খায় এবং

উৎপাদিত দুধের পচন রোধকল্পে মিক্স ক্রিম সেপারেটরের ব্যবহার করা শুরু করে। কোভিড-১৯ শেষ হওয়ার পর আর তারা আবার নতুন উদ্যমে শুরু করেন। এরপর তারা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সুরমাগেইট দুধ উৎপাদনকারী দলের সদস্য হয়ে অনেক পিজি খামারির কাছ থেকেও তারা ন্যায্যমূল্যে দুধ সংগ্রহ করে থাকেন। দুধওয়ালা ২০২১ সালে এলডিডিপি কর্তৃক প্রথমবার উদযাপিত দুধ সপ্তাহে "ডেইরি আইকন" নির্বাচিত হয়। তারপর ২০২২ সালে প্রথম ধাপে প্রদত্ত ম্যাচিং গ্রান্ট এর লার্জ স্কেল মিক্স প্রসেসিং ক্যাটাগরিতে এলডিডিপি হতে ম্যাচিং গ্রান্ট লাভ করেন। প্রাণিসম্পদ দপ্তরের কর্মকর্তাদের পরিচর্যা এবং এলডিডিপি প্রকল্পের অর্থ সহায়তায় "দুধওয়ালা" আজ সিলেটের একটি প্রথম সারির দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। বর্তমানে "দুধওয়ালা প্রতিদিন প্রায় ৪,০০০ লিটার দুধ খামারিদের কাছ থেকে ন্যায্যমূল্যে সংগ্রহ করে থাকেন। এর ফলে সুরমাগেইট দুধ উৎপাদনকারী দল-এর সদস্য-সহ অন্যান্য অনেক পিজি গ্রুপের সদস্যরা আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। এর ফলে দুধ প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানও খামারিদের ন্যায্যমূল্য প্রদান করতে বাধ্য হচ্ছেন। যার ফলে সিলেটের খামারিরা দুধ খামার স্থাপনে আগ্রহী হচ্ছেন এবং দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দুধওয়ালা ফুড প্রোডাক্টস এর অন্যতম দুজন মালিক সিলেট সদরের "সুরমাগেইট দুধ উৎপাদনকারী দল"-এর সদস্য হিসেবে ১৫ টি এলএফএফএস প্রশিক্ষণ সহ পিজিতে প্রদেয় সকল সহায়তা পেয়েছেন। পাশাপাশি প্রকল্প কর্তৃক প্রদেয় ম্যাচিং গ্রান্ট এর আওতায় দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং মিষ্টি বানানোর আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ৮৩ লক্ষ টাকা পেয়েছেন।

দুধওয়ালা একটি অনুপ্রেরণা

হোম ডেলিভারির মাধ্যমে দুধ বিক্রি শুরু করা "দুধওয়ালা" প্রাণিসম্পদ দপ্তরের কর্মকর্তাদের পরিচর্যা এবং এলডিডিপি'র অর্থ সহায়তায় সিলেটের একটি প্রথম সারির দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন খামারির কাছ থেকে প্রতিদিন প্রায় ৪ থেকে ৫ হাজার লিটার দুধ ন্যায্য মূল্যে ক্রয় করে থাকে। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকা লেনদেনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে সরাসরি অবদান রাখছে।

সিলেটে দুধের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পেলেও খামারিগণ ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় ছোট ও মাঝারি অনেক খামার বন্ধ হয়ে পড়েছিল। সেইসব খামার আবার ঘুরে দাঁড়ানো শুরু করেছে এবং পাশাপাশি অনেক নতুন উদ্যোক্তা গাভী পালনে আগ্রহী হচ্ছে। বর্তমানে দুধওয়ালা'র ১টি কারখানা-সহ ৫টি শো-রুম সিলেট শহরে রয়েছে যেখানে প্রায় ৫০ জন কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

“দুধওয়ালা”-এর সাফল্য দেখে অনেক দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, যার মাধ্যমে সিলেটের জনগণ প্রকৃত দুগ্ধ-জাতীয় পণ্য পেয়ে থাকেন। “দুধওয়ালা”-এর কারণে সিলেটের প্রত্যেকটি দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান খামারিদের ন্যায্য মূল্য প্রদান করতে বাধ্য হচ্ছে। এর ফলে সিলেটে খামার স্থাপনে মানুষ আগ্রহী হচ্ছে যা সিলেট তথা দেশের অর্থনীতিতে বিশাল প্রভাব ফেলছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

“দুধওয়ালা” সৃষ্টির মূল কারণ হলো দুধের ন্যায্য মূল্য না পাওয়া। “দুধওয়ালা”-এর অন্যতম মালিক শাকিল জামান বলেন “খামারিরা বহুত কষ্ট করিয়া দুধ উৎপাদন করি কিন্তু এর ন্যায্য মূল্য পাই না। পাশাপাশি দুধের টেকা সাথে সাথে দেইন না, কোন কোন সময় পুরা দাম দেইন না, আবার দুধ কাটিয়াও রাখি দেয়। আমরা দেখলাম, আমরা যেরা দুধ কিনে, তারার কাছে আটকাই যাইরাম। কষ্ট করি আমরা আর ফল খাইন তারা, এর লাগি রাগে দুঃখে তারার কাছে দুধ বিক্রি না করিয়া নিজেরাই সরাসরি বাড়িত বাড়িত ডেলিভারির মাইধ্যমে দুধ বেচা শুরু করি দেই। হিসময় যদি এই রিক্স না লইতাম, তাইলে আইজও আমরা তারার কাছে বান্ধা থাকতাম”।

“দুধওয়ালা”-এর আরেক মালিক মোতাহার হোসেন সোহেল বলেন, “আমরার হেই সাহসের লাগি আইজ সারা সিলেটের মানুষ দুধের ন্যায্য দাম পাইরা। আমরার আরেকটা টার্গেট হইতাছে সিলেটে একটা মানসম্পন্ন দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করা যিটার কাজ অলরেডি বিসিকও চলের। পাশাপাশি সিলেটের বাইচারা যাতে বিভিন্ন জুস-এর বদলে প্রতিদিন অন্তত ২৫০ গ্রাম দুধ খায় (যেমনঃ চকলেট দুধ, আম দুধ ইত্যাদি) ইটার ব্যবস্থা করা। বিগত ৫/৬ বছরে দুধওয়ালা অনেক পরিণত হয়েছে এবং এর ব্যবসা দিন দিন বৃদ্ধি করে চলেছে। দুধওয়ালাকে অনুসরণ করে বিভিন্ন দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান তৈরি হচ্ছে যার ফলে খামার স্থাপনে আগ্রহী উদ্যোক্তার পরিমাণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে।

একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ আদর্শ খামারি মিজানুর রহমানের গল্পগাথা

কোন বিশ্রাম নেই মিজানুর রহমানের, সারাদিন কাজ আর কাজ। ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে মিজানুর লেগে যান তার খামারের কাজে। গরুর খাবার, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, গরুর সমস্যা চিহ্নিত করে তার প্রতিকার। উপজেলা পশু সম্পদ অফিসের সাথে যোগাযোগ। ঠিক সময়ে গরুর খাবার জোগাড় করা, এলাকার অন্য খামারিদের কাছ থেকে দুধ সংগ্রহ করা, দুধ প্রক্রিয়াজাত করা, দুধ সংগ্রহ করার যন্ত্রপাতি ঠিক করা। এই ভাবে মিজানুরের দিন চলে যায় নানামুখী ব্যস্ততায়। আবার প্রডিউসার গ্রুপের সাথে যোগাযোগ, তাদের উৎসাহ প্রদান, নিয়মিত মিটিং পরিচালনা করা। এই মিজানুরের বাড়ি রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলার গড়গড়ি ইউনিয়নের চাঁদপুর গ্রামে। পদ্মা নদী বিধৌত পলির কারণে এখানকার জমির উর্বরতা অনেক বেশী। এখানে সারা বছর ফসল ভাল হয়। এখানকার মানুষ প্রধানত কৃষিজীবী। নদীর পাড়ের মানুষের মত এখানকার মানুষজন অনেক বেশী কর্মঠ। পদ্মা নদীর কারণে এখানে অনেকে মৎস্যজীবীও বসবাস করেন।

মিজানুর রহমান অনেকদিন ধরে ছোট পরিসরে গাভী পালন করতেন। নিজের ৫টি গাভী দিয়ে দুধ উৎপাদন করে স্থানীয় এলাকায় বিক্রি করতেন, আবার স্থানীয় বাজারে মিষ্টির দোকানে বিক্রি করতেন। অনেক সময় দুধ সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় গরমের কারণে তার দুধ নষ্ট হয়ে যেত, অনেক সময় দুধের ন্যায্য দাম পাওয়া যেত না। এলাকায় বাজার সংযোগ দুর্বল ছিল। আবার গাভীর সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে দুধ উৎপাদন কম হতো। যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাবে গাভীর খামার পরিচালনার জন্য তার অতিরিক্ত ব্যয় হতো, ফলে তার আর্থিক ক্ষতি হতো। সঠিক প্রশিক্ষণ, আধুনিক প্রযুক্তির অভাবে তার এই স্বল্প পরিসরের খামারটি লাভজনক হতে পারছিল না। মাসের শেষে তার খামার থেকে আয় কম কিন্তু ব্যয় বেশী। এতো পরিশ্রম করেও মাসের শেষে তার খামার থেকে আয় ক্রমশ কমে যেতে থাকে। মিজানুর রহমানের খামার ব্যবসার প্রতি আগ্রহ কমতে থাকে। এমন সময় “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প”এর মাধ্যমে মিজানুর রহমান অনেকগুলি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ডেইরি খামার ব্যবস্থাপনা, দুধের মান নিয়ন্ত্রণ, রোগব্যাধি প্রতিরোধ, দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারসংযোগ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন। এই প্রশিক্ষণ এর পাশাপাশি মিজানুর রহমান এর খামারে এলডিডিপি প্রকল্প থেকে একটি মিল্ক চিলিং প্লান্ট নির্মাণে সহযোগিতা করা হয়। এই মিল্ক চিলিং প্লান্ট নির্মাণের ফলে দুধ সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ তৈরি হয়। এখন দুধ

নষ্ট হওয়ার পরিমাণ অনেক কমে গেছে। এ ছাড়া প্রকল্প থেকে মিল্ক ক্যান, মিল্ক বাকেট, মিল্ক মেজারিং পাত্র, হ্যান্ড গ্লাভস, তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা মাপার যন্ত্র, গামবুট ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। মিজানুর রহমান বলেন, ‘প্রকল্পের দেওয়া প্রশিক্ষণের কারণে এখন গাভীর যত্ন, খামার ব্যবস্থাপনা ও গাভীর রোগব্যাধি নিয়ন্ত্রণে আমি আরও বেশি দক্ষ হয়েছি, এখন কোন সমস্যা হলে বিচলিত না হয়ে প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান ও উপজেলা পশু হাসপাতালের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি’।

মিজানুর রহমান একজন ব্যতিক্রমী খামারি:

সূচক	পূর্বে	বর্তমানে
প্রতি গাভীর দুধ উৎপাদন	২.৮ লিটার	৬.৪ লিটার
মাসিক আয় (টাকা)	৯০০০	১৮৫০০
প্রক্রিয়াজাত দুধ	০ লিটার	১০০ লিটার

মিজানুর রহমান প্রজেক্টের সাথে জড়িত হওয়ার পর থেকে একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ আদর্শ খামারি এবং একজন সফল দুগ্ধ উৎপাদনকারী ব্যবসায়ীতে পরিণত হয়েছেন। বর্তমানে তার খামারের পরিধি আরও ব্যাপকতা লাভ করেছে। এখন তার গাভীর সংখ্যা ১৫ টি, আগে ছিল ৫টি। আগে দুধ উৎপাদন হতো প্রতি গাভী থেকে ২.৮ লিটার আর এখন প্রতি গাভী থেকে উৎপাদন হয় ৬.৪ লিটার। এখন দুধ নষ্ট হওয়ার হার একদম নেই বললেই চলে। পূর্বে মাসে আয় ছিল আনুমানিক ৯০০০ টাকা এখন মাসে আয় করেন ১৮,৫০০ টাকা। প্রতি মাসে ১০০ লিটার দুধ প্রক্রিয়াজাত করে অতিরিক্ত আয় করে থাকেন। তিনি নিজের খামারের পাশাপাশি ৫০ জন ক্ষুদ্র খামারির কাছ থেকে দুধ সংগ্রহ করে থাকেন। তিনি নিজেই এখন দুধ থেকে দই, ঘি, মিষ্টি ও মাঠা উৎপাদন করে নতুন বাজার সৃষ্টি করেছেন। এলাকার ছোট ছোট খামারিদের একত্র করে প্রডিউসার গ্রুপ গঠনে সহায়তা করেছেন। সেই গ্রুপের নিয়মিত মিটিং ও চাঁদা প্রদান করে গ্রুপকে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। গ্রুপের মাধ্যমে দুধ সংগ্রহ ও মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য তিনি অন্যদেরকে সুপরামর্শ দিয়ে থাকেন। প্রডিউসার গ্রুপের অন্য সদস্যদেরকে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। সবাইকে নিয়ে একটি সুষ্ঠু ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন। যার ফলে স্থানীয় প্রডিউসার গ্রুপ তাদের পণ্যের বাজার সংযোগ তৈরি করেছে। মিজানুর রহমানের উদ্যোগে স্থানীয় কাঁচাবাজারে দুধ সরবরাহ বৃদ্ধি হয়েছে। দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণের ফলে মূল্য সংযোজন হয়েছে, প্রাণিসম্পদ

অফিসের সেবার সাথে সরাসরি খামারিগণের সংযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মিজানুর রহমান একজন স্বপ্নের সারথি, তিনি নিজে যেমন স্বপ্ন দেখতে ভালবাসেন এবং স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারেন। ঠিক তেমনি মিজানুর রহমান অন্যকেও স্বপ্ন দেখাতে পারেন। প্রকল্প থেকে তিনি যেমন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন আবার তিনি এলাকার ছোট ছোট খামারিদের শেখান কিভাবে দুধের মান নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, কিভাবে গাভীর যত্ন নিতে হয়, যার ফলে রোগব্যাধি প্রতিরোধ করা যায়। মিজানুর রহমান বলেন, “এলডিডিপি আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে, আগে দুধ সংরক্ষণ ও বিক্রির সমস্যা ছিল, এখন আর সেই চিন্তা নেই। চিলিং প্লান্টের মাধ্যমে দুধ সংরক্ষণ সহজ হয়েছে, আর প্রক্রিয়াজাতকরণ করে বাড়তি আয় হচ্ছে”। এলডিডিপি প্রকল্পের সহায়তায় মোঃ মিজানুর রহমান শুধু নিজের খামার নয়, পুরো এলাকার দুধ সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: এই খামারকে কেন্দ্র করে মিজানুরের অনেক স্বপ্ন, অনেক পরিকল্পনা। তিনি ভবিষ্যতে তার খামারে গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চান, ২৫ থেকে ৩০ টি গাভীর খামার করতে চান। দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন করতে চান এবং সেই সাথে নিজের একটি মিনি প্রসেসিং ইউনিট স্থাপন করতে চান।

কুড়িগ্রামের সফল খামারি রিনা বেগম

বাংলাদেশের উত্তরের জেলা কুড়িগ্রাম। নদী ভাঙ্গনের জেলা কুড়িগ্রাম বন্যা প্রবণ এবং দারিদ্র পীড়িত এলাকা। এখানকার সংগ্রামী মানুষেরা টিকে থাকার জন্য, জীবিকার জন্য গবাদিপশু লালন পালন করে থাকেন। মানুষরা অনেক বেশী নির্ভরশীল প্রাণিসম্পদ এর উপর। এখান থেকে যে আয় হয় সেই আয় দিয়ে তারা জীবনযাপন করে থাকেন। ঠিক তেমনি কুড়িগ্রাম পৌরসভার বাসিন্দা রিনা বেগম একজন দরিদ্র গ্রামীণ নারী খামারি। কয়েকটি গাভী নিয়ে তার খামার। কিন্তু তার গাভীগুলো রাখার উপযুক্ত পরিবেশ ছিল না; ফলে নিয়মিত রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হতো এবং দুধের উৎপাদনও কম ছিল। অর্থনৈতিকভাবে তিনি পরিবারের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। মানুষের যেমন ভাল থাকার জন্য একটি স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন প্রয়োজন ঠিক তেমনি প্রাণীরও স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন প্রয়োজন। গাভীদের আবাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্থান ও পরিবেশ নির্বাচন সঠিক না হলে খামার লাভজনক করা যায় না। গাভীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু আবাসন বা বাসস্থান তৈরি করতে হয়, যা যথেষ্ট উঁচু ও বন্যামুক্ত। বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের সুবিধা থাকতে হয় যাতে খামার থেকে সহজে পানি সরবরাহ ও পানি নিষ্কাশন করা যায়। খামারে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো নিশ্চিত করা আবশ্যিক হয়। খামারে খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থা ভালোভাবে করতে হয়। খামারের চারপাশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। মোট কথা আবহাওয়া ও জলবায়ুর কথা চিন্তা করেই গাভীর আবাসন ব্যবস্থা করতে হয় তবেই না, সেই খামারটি একটি লাভজনক খামারে পরিণত হয়। জলবায়ু সহিষ্ণু একটি খামার শেড তৈরি করে গাভীর জন্য আরামদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। বৈরী বা খারাপ আবহাওয়া থেকে রক্ষা করে গবাদিপশুর রোগপ্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

এলডিডিপি সংযোগ

কুড়িগ্রাম পৌরসভার রিনা বেগম এমনিতে দরিদ্র খামারি, তার নিজের আবাসন ব্যবস্থা অত্যন্ত নাজুক তার উপর তার গাভীর আবাসন ব্যবস্থা করা তার জন্য অনেক ব্যয়বহুল ও কষ্টকর। এই হতাশার মধ্যেই রিনা বেগম সন্ধান পান প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প” এর। তিনি পিজি গ্রুপের সদস্য নির্বাচিত হন। এলডিডিপি প্রকল্পের সহায়তা তার জীবনে পরিবর্তনের নতুন দ্বার উন্মোচন করে, যা তাকে একজন আত্মনির্ভর নারী খামারিতে পরিণত করেছে। প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও উপজেলা

প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় তিনি আজ একজন সফল খামারি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। এলডিডিপি প্রকল্পের মাধ্যমে রিনা বেগম ৫টি গাভীর জলবায়ু সহিষ্ণু শেড পেয়েছেন। এর ফলে গাভীগুলোর থাকার পরিবেশ উন্নত হয়েছে, যা প্রাণিসম্পদের স্বাস্থ্য ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শেড পাওয়ার পর গাভীগুলোর স্বাস্থ্য ভালো রয়েছে, রোগের প্রকোপ অনেক কমে গেছে। যেহেতু শেডটি জলবায়ু সহিষ্ণু, তাই গরমের সময় গরুগুলো অতিরিক্ত তাপজনিত কষ্ট পায় না এবং আরামদায়ক ভাবে থাকতে পারে। ফলে দুধ উৎপাদন উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। তিনি এখন দুধ বিক্রি করে নিয়মিত আয় করছেন এবং পরিবারের ব্যয় নির্বাহ সহ সঞ্চয়ও করতে পারছেন।

রিনা বেগমের সাফল্য

জলবায়ু সহিষ্ণু গাভী শেডের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের স্বাস্থ্য ও উৎপাদন দুটোই বেড়েছে। নারীর অংশগ্রহণ, আত্মবিশ্বাস ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এলডিডিপি প্রকল্পে যুক্ত হওয়ার আগে রিনা বেগমের খামারে একটি গাভী দৈনিক দুধ উৎপাদন করত ৭ লিটার আর প্রকল্প বাস্তবায়নের পর গাভী প্রতি দুধ উৎপাদন হয় ১২ লিটার। আগে গাভীগুলো প্রায়ই রোগে আক্রান্ত হতো আর এখন গাভীগুলোর রোগের প্রকোপ অনেকাংশে কমে গেছে ফলে গাভীর স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতা উন্নত হয়েছে। প্রকল্পের আগে রিনা বেগমের মাসিক আয় ছিল ১৩,০০০/- টাকা আর এখন তার আয় প্রায় ২১,০০০/- টাকা।

সূচক	প্রকল্পের পূর্বে	প্রকল্প বাস্তবায়নের পর
গাভী প্রতি দৈনিক দুধ উৎপাদন	৭ লিটার	১২ লিটার
মাসিক গড় আয়	১৩,০০০ টাকা	২১,০০০ টাকা

রিনা বেগম এখন এলাকার আলোচিত নারী খামারি

আগে পরিবারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন আর এখন নিজ আয়ে স্বাবলম্বী এবং অন্যদের জন্য অনুপ্রেরণা। নারী ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তার নেতৃত্ব গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। রিনা বেগম এখন স্থানীয় নারীদের খামার স্থাপনে পরামর্শ দিচ্ছেন। তিনি অন্যদেরকে শেখান একটি জলবায়ু সহিষ্ণু খামার শেডে কিভাবে গর্ভবতী, প্রসূতি ও বাছুরের সঠিক পরিচর্যা করা যায়, রোগব্যাধির চিকিৎসা করা যায়, কত সহজে খামার পরিষ্কার করা যায়, গোবর ও অন্যান্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা যায়। এই ধরনের শেডটি উন্নত ভেন্টিলেশন ও শুকনা থাকায় গাভীর ওলান প্রদাহ হয় না। শেডের ভিতরে সঠিক স্থানে খাওয়ার জায়গা থাকায় খাদ্যের গুণগত মান ঠিকই

থাকে ফলে গাভীর উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তার পরামর্শে ও তার খামার দেখে আশেপাশের অনেক নারী খামার গড়তে আগ্রহী হয়েছেন। এভাবেই রিনা বেগম এখন এলাকার একজন আদর্শ নারী খামারি।

রিনা বেগম বলেন, “আগে গাভীগুলোর জন্য উপযুক্ত জায়গা না থাকায় অনেক কষ্ট হতো। এখন এই শেডের কারণে গরুগুলো সুস্থ থাকে, গরমেও কষ্ট পায় না, দুধও বেশি হয়। আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছি-এটা আমার সবচেয়ে বড় সাফল্য।”

রিনা বেগমের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

শেডটি টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব ভাবে নির্মিত হওয়ায় দীর্ঘদিন ব্যবহার করা যাবে। রিনা বেগম এখন নিজ উদ্যোগে খামার সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছেন। ভবিষ্যতে তিনি আরও গাভী কিনে খামার বড় করার পরিকল্পনা করেছেন যা দেখে এই এলাকার নারীরা এই কাজে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে।

আমেনা বেগমের স্বপ্নযাত্রা

একজন আমেনা বেগম ও তার গ্রামীণ জীবন

নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার মেঘনা নদীর তীরের গোপালপুর ইউনিয়ন। নদী ভাঙ্গন যাদের জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে, সেই গোপালপুর ইউনিয়নের রসুলপুর গ্রামের আমেনা বেগম একজন সাধারণ গৃহিণী। স্বামী আর তিন সন্তান নিয়ে তার সংসার। অভাবের সাথে নিত্য বসবাস। স্বামী কর্মহীন। আমেনা বেগম চিন্তা করলেন অল্প কিছু পুঁজি সংগ্রহ করে যদি একটা ছোট আকারের মুরগির খামার করা যায়, তবে সংসারের কিছুটা আয়ের ব্যবস্থা হয়। আমেনা বেগম অন্যের কাছ থেকে কিছু টাকা সংগ্রহ করে একটি ছোট খামার গড়ে তোলেন, কিন্তু শুরুর দিকে তার মুরগি পালন করার কোনও অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান ছিল না। তিনি মনে করতেন, খুবই সাধারণ ভাবে মুরগি পালন করা যায়। শুধু মুরগির খাবার দিলেই হয়, মুরগি প্রতিনিয়ত ডিম দিবে আর সেই ডিম থেকে বাচ্চা ফুটবে আর ডিম আর মুরগি বিক্রি করে আয় করবেন। তিনি জানতেন না, মুরগির জাত নির্বাচন করতে হয়, মুরগির জন্য বাসস্থানের পরিবেশ ভাল রাখতে হয়, মুরগির চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা জানতে হয়। কি করলে মুরগির রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় সে বিষয়ে জানা দরকার হয়। অধিক লাভের জন্য আধুনিক মুরগি পালন সম্পর্কে কোনো কিছুই তিনি জানতেন না। যার ফলে তিনি নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হতে শুরু করেন। মুরগি ঠিকমত ডিম দেয় না, মুরগি ঠিকমত খায় না, মুরগির বৃদ্ধিও ঠিকমত হয়না। একসময় বার্ড ফ্লু তে তার সব কয়টি মুরগি মারা যায়। আমেনা বেগম হতাশ হয়ে পড়েন, আবার তার জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

দিশাহারা আমেনা বেগমের স্বপ্নযাত্রা

এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে আমেনা বেগম সন্ধান পান প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের। তিনি এই প্রকল্পের প্রডিউসার গ্রুপে যুক্ত হন। গ্রুপ সদস্য হয়ে প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে অনেকগুলো বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তার প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল-

- ডিম পাড়া মুরগির উৎপাদন ও হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা।
- উর্বর ডিম ব্যবস্থাপনা।
- জীবাণুমুক্তকরণ ও শনাক্তকরণ পদ্ধতি।

- ডিম প্রস্ফুটনের উন্নত পদ্ধতি।
- হ্যাচিং ও ব্রুডিং পদ্ধতি।
- আলোক ব্যবস্থাপনা।
- খাদ্য ও পানি ব্যবস্থাপনা।
- টিকাদান পদ্ধতি ও টিকাদান সময়সূচী।
- সুস্থ বাচ্চার বৈশিষ্ট্য ও অসুস্থ বাচ্চা শনাক্তকরণ।
- মুরগির উল্লেখযোগ্য রোগের লক্ষণসমূহ এবং তাদের প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া। এবং
- উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান ব্যবস্থাপনা।

এছাড়াও তিনি প্রকল্প থেকে মুরগির ঘর, মুরগির খাদ্য, পানির পাত্র প্রভৃতি সহায়তা পেয়েছেন। প্রশিক্ষণ ও নানা রকম সহায়তা পেয়ে আমেনা বেগম আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। প্রকল্পের আগে তিনি ৬০০ মুরগি নিয়ে লালন পালন শুরু করলেও সেখান থেকে তিনি খুব বেশিদিন ডিম উৎপাদন করতে পারেননি। পরবর্তীতে তিনি প্রকল্প সহায়তায় প্রশিক্ষণ নিয়ে ১০০০ মুরগি নিয়ে খামার শুরু করেন। সেখান থেকে তিনি দৈনিক ৮০০-৮৫০ টি ডিম উৎপাদন করেছেন। ডিমগুলো তিনি পাইকারি বিক্রেতার কাছে নির্ধারিত বাজার মূল্যে বিক্রি করেছেন। এতে তার মাসিক লাভ হয়েছে ২৫ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকা। তিনি তার মুরগিগুলো ১ লাখ ২০ হাজার টাকায় বিক্রি করে নতুন ভাবে ১২০০ মুরগি তার খামারে যুক্ত করেছেন। ডিম উৎপাদন শুরু হলে মাসে প্রায় ৩৫ হাজার থেকে ৪০ হাজার টাকা লাভ করতে পারবেন বলে তিনি আশাবাদী। আয় বৃদ্ধির টাকা দিয়ে তিনি ঋণ পরিশোধ করছেন। আমেনা বেগম মুরগি পালনের পাশাপাশি হাঁস পালন শুরু করেছেন। বর্তমানে তার হাঁসের সংখ্যা প্রায় ৫০ টি। তিনি প্রতিদিন প্রায় ২০ টি ডিম উৎপাদন করেন।

সূচক	প্রকল্পের পূর্বে	প্রকল্প বাস্তবায়নের পর
মুরগির সংখ্যা	৬০০	১২০০
হাঁসের সংখ্যা	০	৫০
ডিমের উৎপাদন	৪৫০	৮০০
মুরগি বিক্রি থেকে আয়	১২,০০০-১৫,০০০	২৫,০০০-৩০,০০০

আমেনা বেগম বলেন “প্রকল্পের মাধ্যমে মুরগি পালনে অনেক লাভ হইছে। আগে তো আমি মুরগি পালনের কিছুই জানতাম না। এখন বার্ড ফ্লু, রাণীক্ষেত এসব রোগ সম্পর্কে জানতে পারছি। ভ্যাক্সিন বিষয়ে জানছি। আগে তো অনেক মুরগি মারা গেছে। আমার তো এই খামার দিয়েই সংসার চলে।”

অন্য উচ্চতায় আমেনা বেগম

প্রকল্পের সহায়তায় আমেনা বেগম তার মুরগির খামারে আধুনিক পালন ব্যবস্থা, টিকা ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্যসুরক্ষা, সঠিক খাদ্য সরবরাহ সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে দক্ষতা অর্জন করেছে। এই প্রযুক্তিগুলো প্রয়োগের ফলে তার মুরগির বেঁচে থাকার হার বেড়েছে, উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং লাভের পরিমাণও আগের তুলনায় অনেক বেশী হয়েছে। আমেনা বেগম তার সাংসারিক খরচ এবং ছেলেমেয়ের পড়াশোনার ব্যয় নির্বাহের জন্য পুরোপুরি তার খামারের উপর নির্ভরশীল। এখন তার স্বামী আনিসুর রহমান তাকে তার খামারের ব্যাপারে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা করছেন। আমেনা বেগমকে দেখে তার গ্রামের অন্যান্য ক্ষুদ্র খামারিগণ অনুপ্রাণিত হচ্ছেন এবং তাদের খামারের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য তার কাছ থেকে মুরগি পালনের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ নিতে আসেন। তিনি তার অভিজ্ঞতা আশেপাশের খামারিদেরকেও জানাচ্ছেন। তিনি তাদের কে বলেন,

- মুরগির ঘরটি যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গাতে হয়।
- ঘরটি যেন বাতাস চলাচলের উপযোগী হয়।
- মুরগিগুলোকে শিকারি প্রাণীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে চারিদিকে দিয়ে নেটে বেড়া দিতে হয়।
- খামার ঘরের মেঝেতে খড় বা কাঠের গুড়া ব্যবহার করতে হয়।
- মুরগিগুলোকে খাবার এবং পানির পাত্র দেওয়ার জন্য আলাদা আলাদা পরিষ্কার পাত্র রাখতে হয়।

আমেনা বেগমের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

আমেনা বেগম ধীরে ধীরে তার ব্যবসার পরিধি বাড়াতে চান। একবারে রাতারাতি বড় খামার করতে চান না, নিজের সাধের মত থাকতে তিনি ভালবাসেন। তার খামারে পর্যায়ক্রমে মুরগির সংখ্যা বাড়ানোর জন্য অগ্রহী।

ফেরিওয়ালা থেকে ব্যবসায়ী গাইবান্ধা জেলার সাদুল্লাপুর উপজেলার "শেখ দই ঘর"

প্রাণিসম্পদ এবং ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল প্রান্তিক পর্যায়ে উৎপাদিত দুধ সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাত করে বাজারে সরবরাহ করা। এ লক্ষ্যে নিজস্ব বিনিয়োগ সাপেক্ষে ১৫টি প্রতিষ্ঠানকে ১টি হাব ও ২০টি ভিলেজ মিল্ক কালেকশন সেন্টার (ভিএমসিসি) প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রান্ট মানি দুই কোটি একষটি লাখ টাকা প্রদান করা হয়। ২০২৩ সালে সাদুল্লাপুর উপজেলার শেখ দই ঘর ডেইরি হাবের জন্য নির্বাচিত হয়।

ভিএমসিসি- এর মূল উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম দুধ সংগ্রহ: স্থানীয় খামার থেকে উৎপাদিত দুধ সরাসরি সংগ্রহ করা। সংরক্ষণ: সংগৃহীত দুধ তাৎক্ষণিক ভাবে সংরক্ষণ করা, যাতে গুণগত মান বজায় থাকে।

বাজারজাতকরণ: সংরক্ষিত দুধ ডেইরি হাবের মাধ্যমে বড় বাজার বা প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্টে সরবরাহ করা।

শেখ দই ঘর এর সফলতার গল্পটা জানা দরকার। বাংলাদেশের উত্তরের জেলা গাইবান্ধা। বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া এই কৃষিজীবী সমাজে সারা বছর কাজ থাকেনা, আবার নদীভাঙ্গন প্রবণ এলাকা। এই জেলার সাদুল্লাপুর উপজেলার জামালপুর ইউনিয়নের অনেকেই গাভী পালন করে থাকেন। গ্রামের পথ দিয়ে যেতে যেতে গরুর ডাক শোনা যায়। গৃহস্থদের কেউ কেউ গোবর পরিক্ষার করছেন, কেউবা দুধ সংগ্রহ করছেন। সেই গ্রামের দুই সহোদর জরিফ শেখ ও মোস্তফা শেখ ২০০৪ সালে পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও বাড়তি আয়ের আশায় একটি উন্নত জাতের গাভী পালন শুরু করে। দুই ভাই পালাক্রমে গাভীর যত্ন নিতে থাকেন। এলাকার অন্য খামারির মত তারাও সকালে একবার বিকালে একবার তাদের সংগ্রহ করা দুধ নিয়ে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করতে আসতো। কোনদিন আবার সব দুধ বিক্রি হত না, আবার যে দুধ বিক্রি হতো তার ন্যায্য দাম পেত না। দিন দিন তারা লোকসানে বিবর্ণ হতে থাকে। তখন তারা দুই ভাই সিদ্ধান্ত নিয়ে পালাক্রমে বাইসাইকেলে করে গাইবান্ধা শহর বিভিন্ন বাসায় সরবরাহ করতে থাকেন। তাদের দুধের গুণগত মান ভালো হওয়ায় এবং গ্রাহকের চাহিদা ও সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাওয়ায় তারা আশেপাশের খামারিদের কাছ থেকে দুধ সংগ্রহ শুরু করেন এবং ব্যবসা সম্প্রসারণ করা শুরু করেন। দিনের পর দিন তাদের দুধ সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন তারা সংগৃহীত দুধ মোটরসাইকেল ও ভ্যানে করে গাইবান্ধা শহরের বিভিন্ন মিষ্টি ও চায়ের দোকান এবং সাধারণ ভোক্তাদের নিকট বিক্রি করে এবং বাসা বাড়ির পাশাপাশি বিভিন্ন

হোটেলে সরবরাহ করতে থাকে। স্থানীয় প্রাণিসম্পদ বিভাগের সহযোগিতায় কয়েক বছরের মধ্যে তারা ২৬০০ জন খামারিকে সংগঠিত করে এবং প্রতিদিন তারা ১১ হাজার লিটার দুধ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়।

২০০৭ সালে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে কেয়ার বাংলাদেশ হতে সম্মাননা প্রাপ্ত হয়। ২০১২ সালে ছোট পরিসরে মিষ্টির দোকান শুরু করে এবং ২০২১ - ২০২৩ পর্যন্ত উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর কর্তৃক আয়োজিত প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীতে শিল্প উদ্যোক্তা ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান অর্জন করে থাকে।

এই সহযোগিতার ফলে তার খামারির সংখ্যা ২৬০০ থেকে ৭ হাজারে উন্নীত হয়েছে এবং বর্তমানে দৈনিক ৩২ হাজার লিটার দুধ স্থানীয় খামারিদের কাছ থেকে ৫০ টাকা লিটার মূল্যে সংগৃহীত হচ্ছে। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠানে ৩৫০ জন শ্রমিক কর্মরত রয়েছে। এই ডেইরি হাব হতে প্রতিদিন ৮ হাজার লিটার মিল্ক ভিটাতে, ১১ হাজার লিটার প্রাণ ডেইরিতে, ৭ হাজার লিটার আড়ং ডেইরিতে এবং ৬০০০ লিটার মিষ্টান্ন ভাঙারে সরবরাহ করা হচ্ছে, যা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দুধের ঘাটতি পূরণে সহায়তা করছে। এই ডেইরি হাব স্থাপিত হওয়ায় প্রত্যন্ত অঞ্চলের খামারিরা সহজেই দুধ বিক্রয় করতে পারছে ফলে সাধারণ খামারি এবং ভোক্তা ২ (দুই) পক্ষই উপকৃত হচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানটি সর্বসাধারণ কর্তৃক প্রশংসিত হচ্ছে। দুধ উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, মূল্য সংযোজন ও মানসম্মত পণ্য বিক্রয়ে অবদান রাখার জন্য জরিপ শেখ ও মোস্তফা শেখ কে প্রাণিসম্পদ বিভাগ ২০২৩ সালে ডেইরি আইকন হিসেবে বিবেচনা করে।

বাজার সংযোগ: জরিফ শেখ এর ভাষ্য মতে, রংপুর ও গাইবান্ধা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ২০টি কালেকশন সেন্টারের মাধ্যমে দুধ সংগ্রহ করা হয়। অধিকাংশ স্থানে মিল্ক চিলিং পয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে। ১০০ টি ইজি বাইকের মাধ্যমে দুধ পরিবহন করা হয়। এর ফলে সময় বাঁচে আর খামারির ঘরের কাছে যেতে পারা যায়। খামারি বান্ধব প্রচেষ্টা জরিফ খানের ব্যবসাকে আরও সম্প্রসারিত করতে সাহায্য করেছে।

অনন্য প্রচেষ্টা: ছোট ছোট খামারিদের জরিফ শেখ নিজ উদ্যোগে ঔষধ সরবরাহ করে থাকেন। যেখানে চিকিৎসা প্রয়োজন সেখানে সহায়তা করে থাকেন। এর ফলে এই সব ছোট ছোট খামারিদের সাথে জরিফ শেখের এক সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে যা, ব্যবসাকে দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকতে সহায়তা করেছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: সাদুল্লাপুর উপজেলার বাইরে অন্যান্য উপজেলার বাজারে ৫টি শোরুম স্থাপন করার পরিকল্পনা আছে। যেখানে শুধুমাত্র দুগ্ধজাত পণ্য বিক্রি করা হবে। শেখ দই ঘরের সত্ত্বাধিকারী জরিফ শেখ বলেন, “গ্রামের ছোট ছোট খামারিরা আমার প্রাণ, তারা টিকে আছে বলেই আজ আমি সফল ব্যবসায়ী। তাদের পূর্ণ সহযোগিতা না পেলে আজ আমি এতদূর আসতে পারতাম না”।

মুরগি খামারি ছালমার স্বপ্ন থেকে সাফল্য

কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলার সদর ইউনিয়নের জগতপুর বাসিন্দা ছালমা একজন উদ্যমী ও পরিশ্রমী নারী খামারি। তিনি নিজ উদ্যোগে দেশি মুরগি লালনপালনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ শুরু করেন। শুরুতে তিনি মাত্র ১৫-১৬টি দেশি মুরগি নিয়ে খামার কার্যক্রম শুরু করেন। সীমিত মূলধন, পর্যাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব থাকা সত্ত্বেও তিনি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। কিন্তু সফলতা না পাওয়ার কারণে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর থেকে তিনি প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ গ্রহণ করেন, যা তার খামার পরিচালনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সীমিত মূলধন ও ছোট পরিসরে খামার গড়ে তুললেও নিয়মিত যত্ন, সঠিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের পরামর্শ গ্রহণের ফলে তিনি ধীরে ধীরে খামারের পরিধি বাড়াতে সক্ষম হন।

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ছালমা একজন সম্ভাবনাময় খামারি হিসেবে নির্বাচিত হন। তাকে দেশি মুরগি পালন বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করা হয়, যাতে তিনি তার খামারকে টেকসইভাবে পরিচালনা করতে পারেন। দেশি মুরগি পালন, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, রোগ প্রতিরোধ, টিকা প্রয়োগ ও খামার পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এতে তিনি খামার পরিচালনা সম্পর্কে ব্যবহারিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জন করেন। একটি উপযুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত মুরগির শেড নির্মাণে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দেওয়া হয়, যাতে মুরগিগুলোর আবাসন ও উৎপাদন পরিবেশ উন্নত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের উপকরণ, মুরগির খাবার, পানির পাত্র, খাবার পাত্র এবং অন্যান্য খামার পরিচালনা সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়।

মুরগির স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় টিকা ও সাধারণ রোগ প্রতিরোধে ব্যবহৃত ঔষধ সরবরাহ করা হয়। এছাড়া স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে নিয়মিত তত্ত্বাবধান ও পরামর্শ প্রদান করা হয়।

অর্থনৈতিক পরিবর্তন: প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির পর তিনি নিয়মিতভাবে টিকা প্রয়োগ, খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং সঠিক যত্ন নেওয়া শুরু করেন। এতে মুরগির মৃত্যুহার কমে যায় এবং উৎপাদন বেড়ে যায়। বর্তমানে তার খামারে ৫০টিরও বেশি দেশি ও ফাউমি মুরগি রয়েছে। নিয়মিত ডিম বিক্রির মাধ্যমে তিনি প্রতি মাসে গড়ে ১০,০০০-১২,০০০ টাকা পর্যন্ত আয় করছেন। এই

আয় দিয়ে তিনি ছাগল ক্রয় করেন এবং প্রতি বছর ছাগল বিক্রয় করে তিনি অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। তিনি এখন নিজ উদ্যোগে পরিবারের জন্য বাড়তি খাবার, পোশাক ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়েছেন।

সূচক	প্রকল্পের পূর্বে	প্রকল্প বাস্তবায়নের পর
মুরগির ডিম উৎপাদন (দিন)	৮-১০ টি	২০ টি
মুরগির মাংস থেকে আয় (বছর)	৩,০০০	২০,০০০
ডিম থেকে মাসিক গড় আয় (টাকা)	৫,০০০	১২,০০০

সামাজিক পরিবর্তন: অর্থনৈতিক উন্নতির পাশাপাশি ছালমার সামাজিক অবস্থানেও পরিবর্তন এসেছে। তার সাফল্য দেখে এলাকার অন্যান্য নারীরাও উদ্বুদ্ধ হয়ে খামার গড়ে তুলতে শুরু করেছেন। স্থানীয় সমাজে এখন ছালমাকে একজন সফল নারী খামারি হিসেবে দেখা হয়। অনেক নারী তার খামার দেখতে আসেন এবং তার কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে নিজের খামার শুরু করেন। এতে স্থানীয়ভাবে নারী উদ্যোক্তা তৈরির ক্ষেত্রে ছালমার ভূমিকা প্রশংসনীয়।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: ছালমা ভবিষ্যতে তার খামারকে আরও বড় পরিসরে সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা নিয়েছেন। তিনি প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প হতে অর্থনৈতিক ও সরঞ্জাম সহায়তা চেয়েছেন যাতে আধুনিক পদ্ধতিতে দেশি মুরগি পালন, ইনকিউবেটর মেশিন স্থাপন ও বাচ্চা উৎপাদন শুরু করতে পারেন। এছাড়া তিনি অন্য নারীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশি মুরগি পালনে উদ্বুদ্ধ করারও ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

সফল খামারি: ছালমা এখন নিজের খামার পরিচালনায় সম্পূর্ণ দক্ষ। তিনি নিয়মিতভাবে মুরগির টিকা প্রদান, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম নিজে পরিচালনা করেন। তিনি আয় থেকে একটি অংশ খামারের পুনর্বিনিয়োগে ব্যবহার করছেন- যেমন খাদ্য কেনা, নতুন বাচ্চা সংগ্রহ ও খামারের উন্নয়ন এবং ছাগল ক্রয়। এর ফলে তিনি আত্মনির্ভর এবং খামারটি লাভজনক অবস্থায় রয়েছে।

টেকসই খামার ব্যবস্থাপনা: নিয়মিত টিকা, পরিচর্যা ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা, আবাসন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করলে খামারটি দীর্ঘমেয়াদে টেকসই করে রাখা সম্ভব। বাজার সংযোগ: স্থানীয় বাজারে দেশি মুরগির ডিম ও মাংসের চাহিদা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ ব্যবস্থা ঠিক রাখতে পারলে ব্যবসায়ী দীর্ঘমেয়াদে টেকসই ভাবে চলতে পারবে। দেশি মুরগির স্থানীয় চাহিদা কাজে লাগিয়ে আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব।

ছালমা বলেন, “প্রকল্পের মাধ্যমে পাওয়া প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা তার ভবিষ্যৎ কার্যক্রমে বড় ভূমিকা রাখবে”।

বুড়িচং এলাকার একজন সফল খামারি ছালমা। তিনি প্রমাণ করেছেন সঠিক প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ পেলে অল্প মূলধন নিয়েও সফল খামার গড়ে তোলা সম্ভব। একজন নারীর সাফল্য অন্যদের জন্য প্রেরণার উৎস হতে পারে, যা সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। ছালমার সাফল্য প্রমাণ করে গ্রামীণ নারীও উদ্যোগী হলে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারেন।

একটি বায়োগ্যাস প্লান্ট

সফিউল বর খোকনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির গল্প

হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলার ধর্মঘর ইউনিয়নের নিজনগর গ্রাম। নিজনগর গ্রামের সফিউল বর খোকন একজন খামারি। ভারতীয় সীমান্তের কাছেই এই গ্রামের অন্যতম প্রধান সমস্যা বিদ্যুৎ সমস্যা, অধিকাংশ সময় বিদ্যুৎ থাকে না যা সফিউলের খামার ব্যবস্থাপনায় প্রচণ্ড বাধা ছিল, খামারের উৎপাদন প্রায়ই ব্যাহত হতো। খামারের প্রচুর পরিমাণ গোবর জুতপ করে রাখার কারণে পরিবেশ দূষিত হওয়ায় এলাকার লোকজন আপত্তি জানাতো। দৈনন্দিন কার্যক্রমে সিলিভারে গ্যাসের ব্যবহার করার ফলে খরচ নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছিল। তদুপরি ফসলি জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহার করার কারণে খরচ বেশি হতো। অথচ তার হাতের কাছেই বায়োগ্যাসের রসদ মজুদ ছিল। সফিউল শুনেছেন বায়োগ্যাস দিয়ে রান্নার কাজ করা যায়, খামারে অর্গানিক সারও তৈরি করা যায়। কিন্তু একটি বায়োগ্যাসের প্লান্ট করতে তো অনেক খরচ হবে বিধায় সফিউল হাল ছেড়ে দেন। সফিউল এক খামার চালাতেই হিমসিম খায় আবার বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মাণের খরচ। কোথায় পাবে সে টাকা? বায়োগ্যাস প্লান্ট করতে অনেক টাকার প্রয়োজন-এই চিন্তা নিয়ে সফিউল তার খামারের কাজে মন দেয়। এতো পরিশ্রম করেও তার খামারের আশানুরূপ উন্নতি হচ্ছিল না, দিনের পর দিন তার লোকসানের পাল্লা ভারি হতে লাগল। এমন সময় সফিউল যোগাযোগ করেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে, তাদের পরামর্শে সফিউল “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প” (এলডিডিপি)এ যোগ দেন। পরবর্তীতে “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প” থেকে ম্যাচিং গ্রান্ট এর মাধ্যমে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়।

বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের পর খামারের গোবর-এর মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ কমে আসে এবং জমিতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। আগে প্রচুর পরিমাণ কেমিকেল সার ও কীটনাশক ব্যবহার করে সবজি-সহ অন্যান্য ফসল ফলাতে হতো। এর ফলে পরিবেশ এবং মানব স্বাস্থ্যের ঝুঁকি বেশি ছিল। বর্তমানে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে প্রচুর পরিমাণ স্লারি পাওয়া যায় এবং তা দিয়ে অর্গানিক সবজি ফলানোর ফলে সার ও কীটনাশক খরচ অনেক কমে গেছে, পাশাপাশি অর্গানিক হওয়ার কারণে সবজির ভালো দাম পাওয়া যায়, ফলে ভালো লাভ হয়ে থাকে। এর ফলে এলাকায় অর্থনৈতিক কর্মচাঞ্চল্য বৃদ্ধি-সহ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে যা এলাকার বেকারত্ব দূর করতে সহায়তা করেছে, পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। আগে বিদ্যুতের সমস্যা থাকায় খামারের

কাজে সমস্যা হতো, ফলে উৎপাদন কম হতো। এলডিডিপি থেকে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট পাওয়ার পর বিদ্যুৎ না থাকলেও জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুতের ঘাটতি দূর করে খামার পরিচালনা সহজ হয়েছে এবং খামারের উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে। বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের উৎপাদিত স্লারি ফসলি জমিতে ব্যবহারের ফলে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমেছে পাশাপাশি অর্গানিক সবজি উৎপাদন করে অনেক লাভ করা যাচ্ছে।

সফিউল বলেন, “এলডিডিপি এর সহায়তায় এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে ও প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তার সার্বিক সহযোগিতায় উক্ত ম্যাচিং গ্রান্ট পরিচালনা করে সুফল ভোগ করছি। খামার পরিচালনা সহজতর হয়েছে, খামারের খরচ কমানোর মাধ্যমে উৎপাদনের সাথে সাথে আয় বেড়েছে, স্লারি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমেছে”।

সফিউলের ভবিষ্যৎ ভাবনা:

সফিউল আরও অনেক স্বপ্ন দেখেন। আশেপাশের ক্ষুদ্র খামারিদের নিয়ে সমবায় ভিত্তিক গ্রুপ তৈরি করে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করার ইচ্ছা রয়েছে। যাতে করে ক্ষুদ্র খামারিরা সাশ্রয়ী মূল্যে গ্যাস ত্রয় করে খামার পরিচালনা করতে আগ্রহী হয়। পার্শ্ববর্তী সকল বাড়িতে গ্যাসের সংযোগ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে যার ফলে কম খরচে এলাকার লোকের গ্যাসের চাহিদা মেটানো যায়।

টেকসই উন্নয়ন ও অনুপ্রেরণা:

এলডিডিপি প্রকল্প থেকে পাওয়া জ্ঞান, প্রযুক্তি ও সহায়তার মাধ্যমে সফিউল আজ তার নিজের একটি টেকসই প্রকল্প সফলভাবে পরিচালনা করছেন। সফিউলের এই যাত্রা প্রমাণ করে সঠিক সহায়তা, পরিকল্পনা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করলে একজন প্রান্তিক মানুষ শুধু নিজের জীবনই পরিবর্তন নয়, নিজের এলাকাকেও পরিবর্তন করতে পারেন। এলাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে পারেন। সফিউল তার এলাকার মানুষের কাছে একটি অনুপ্রেরণার নাম।

সূচক	প্রকল্পের পূর্বে	প্রকল্প বাস্তবায়নের পর
সিলিভার খরচ (মাসে)	২৭০০ টাকা	০
খামারে বিদ্যুৎ ব্যবহার	অধিকাংশ সময় বিদ্যুৎবিহীন	বায়োগ্যাস ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ
খামারের গোবর	এলাকা দূষণের কারণ ছিল	দুষণমুক্ত সারের স্লারি তৈরি হয়
জমিতে সারের ব্যবহার	রাসায়নিক সার	গোবর থেকে উৎপাদিত অর্গানিক সার
ষাঁড় বিক্রয় (বছরে)	০	১,৬৫,০০০ X ৫ = ৮,২৫,০০০ টাকা

স্বাভাবিক সাথী রানীর স্বপ্ন ও সাফল্য

সাথী রানীর জীবন সংগ্রাম:

কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর উপজেলার আমড়াতলী ইউনিয়নের মহেশপুর গ্রামটি মূলত কৃষিনির্ভর এলাকা। অধিকাংশ পরিবারই কৃষি ও গবাদিপশু পালনের উপর নির্ভরশীল। তবে অতিরিক্ত গরম, হঠাৎ বৃষ্টি, শীতের তীব্রতা এই এলাকার খামারিদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাথী রানীও ছিলেন এমনই একজন ক্ষুদ্র খামারি। তার নিজের থাকার জন্য কোনরকম একটা ঘর ছিল, তার গরু রাখার মতো উপযুক্ত ঘর ছিল না। নিজের বসতঘরের পাশেই কোনোমতে দুটি গরু রাখতেন। পর্যাপ্ত জায়গা, বায়ু চলাচল কিংবা ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় গরুগুলো প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ত। তখন তার খামারে ছিল মাত্র ২টি গরু। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৫ লিটার দুধ উৎপাদন হতো। এই সামান্য দুধ বিক্রির টাকায় সংসার চালাতো ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। ঘর না থাকায় গরুর সংখ্যা বাড়ানোর সাহসও পেতেন না। এই সামান্য অর্থ দিয়ে সংসার চালাবেন কিভাবে আর খামার ঠিক করবেন কিভাবে। এই চিন্তায় সাথী রানীর দিন শুরু হয়। অথচ তার গরুর জন্য একটি শেড করা অত্যন্ত জরুরী। ভাল মানের শেড না হলে ভাল দুধ উৎপাদন হয় না।

সাথী রানীর প্রকল্প সংযোগ

সাথী রানীর অনেক স্বপ্ন, তিনি একজন আদর্শ খামারি হতে চান। তিনি যোগাযোগ শুরু করেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প”এর সাথে। প্রকল্পের আওতায় সাথী রানী ১০টি গরুর উপযোগী একটি ক্লাইমেট শেড পান। ক্লাইমেট শেড হলো এমন একটি বৈজ্ঞানিকভাবে নির্মিত গরুর ঘর, যা পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে খাপ খাইয়ে গবাদিপশুকে সুরক্ষা দেয়। এটি এমনভাবে নির্মাণ করা হয়, যাতে-

- পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচল করতে পারে;
- অতিরিক্ত গরমে ঘর ঠাণ্ডা থাকে;
- শীতকালে উষ্ণতা বজায় থাকে;
- বৃষ্টির পানি সহজে বের হয়ে যায়; এবং
- স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় থাকে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে জলবায়ু সহিষ্ণু ঘর হিসেবে ক্লাইমেট শেড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প : সফলতার গল্প

এই শেডে রয়েছে-

- উঁচু ও ঢালু ছাদ, যাতে গরম কম লাগে;
- পর্যাপ্ত জানালা ও খোলা অংশ, যাতে বাতাস চলাচল করে;
- কংক্রিটের মেঝে ও সঠিক ঢাল, যাতে মলমূত্র জমে না থাকে;
- উন্নত ড্রেনেজ ব্যবস্থা;
- আলাদা খাওয়ার জায়গা ও পানির ব্যবস্থা; এবং
- পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার সহজ ব্যবস্থা

প্রকল্পের মাধ্যমে সাথী রানী শিখেছেন, কিভাবে গরুর খাবারের জায়গা তৈরি করতে হয়, সঠিক ড্রেনেজ সিস্টেম কিভাবে করতে হয়, স্বাস্থ্যবিধি মেনে গরু পালন করার পদ্ধতি এই প্রকল্প থেকে তিনি শিখেছেন।

সাথী রানীর অর্থনৈতিক পরিবর্তন

ক্লাইমেট শেড পাওয়ার পর সাথী রানী ধীরে ধীরে তার গরুর সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। বর্তমানে তার খামারে গরুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০টি। এখন প্রতিদিন প্রায় ১৫ থেকে ২০ লিটার দুধ উৎপাদন হয়। এই দুধ বিক্রি করে তিনি-

- সংসারের খরচ নির্বাহ করছেন স্বাচ্ছন্দ্যে;
- ছেলে-মেয়ের পড়াশোনার খরচ বহন করছেন; এবং
- সঞ্চয় করতে পারছেন নিয়মিত।

এছাড়াও তিনি ৩টি বাছুর বিক্রি করে ঋণের কিছু অংশ পরিশোধ করেছেন। বাকি টাকা দিয়ে আরও একটি গরু কেনার পরিকল্পনা রয়েছে। আগে যেখানে মাস শেষে ধার করতে হতো, এখন সেখানে নিয়মিত আয় ও সঞ্চয় সম্ভব হচ্ছে।

সাথী রানীর খামারের পূর্বের এবং বর্তমান চিত্র:

সূচক	প্রকল্পের পূর্বে	প্রকল্প বাস্তবায়নের পর
গরুর সংখ্যা	২ টি	১০ টি
দৈনিক দুধ উৎপাদন	৫ লিটার	১৫-২০ লিটার
বাছুর বিক্রি করে আয়	ছিলোনা	৭৫,০০০ টাকা

সাথী রানীর সামাজিক পরিবর্তন:

অর্থনৈতিক উন্নতির পাশাপাশি সাথী রানীর সামাজিক অবস্থানেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। আগে যেখানে তিনি সংগ্রামী এক গৃহিণী ছিলেন, এখন তিনি একজন সফল খামারি হিসেবে পরিচিত। তার শেড ও খামার দেখে এলাকার অনেকেই

অনুপ্রাণিত হয়েছেন। অনেক খামারি তার কাছে এসে পরামর্শ নিচ্ছেন। ফলে পুরো এলাকায় একটি ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে।

সাথী রানী ও তার খামারের অগ্রগতি:

- দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি: গরু আরামদায়ক পরিবেশে থাকলে বেশি দুধ দেয়।
- রোগ কম হয়: পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে গরুর অসুস্থতা হার কমে আসে।
- খাদ্য অপচয় কম: নির্দিষ্ট খাওয়ার জায়গা থাকায় খাবার নষ্ট হয় না।
- পরিচর্যা সহজ: মলমূত্র দ্রুত পরিষ্কার করা যায়।
- দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ: একবার নির্মাণ করলে দীর্ঘদিন ব্যবহার করা যায়।

সাথী রানী মনে করেন, প্রকল্প থেকে যদি ক্লাইমেট শেড না পেতেন, তাহলে গরু অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকত। দুধ উৎপাদন কম হতো। গরুর সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব হতো না। আয় সীমিতই থেকে যেত আর উন্নতি করা যেত না। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বড় ক্ষতির সম্ভাবনা থাকত। অর্থাৎ, সঠিক ঘর ছাড়া টেকসই খামার গড়ে তোলা প্রায় অসম্ভব। সাথী রানী বলেন, “আগে গরু রাখার মতো ভালো ঘর ছিল না, খুব কষ্ট হতো। প্রকল্পের মাধ্যমে ঘর পাওয়ার পর গরুর সংখ্যা বাড়াইছি। এখন আগের থেকে বেশি দুধ উৎপাদন হয়। এই আয় দিয়ে আমার সংসার ভালোভাবে চলে এবং আমি আগের থেকে অনেক বেশি লাভবান হয়েছি।”

সাথী রানীর এই সাফল্যের গল্প প্রমাণ করে যে সঠিক পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও অবকাঠামোগত সহায়তা পেলে একজন ক্ষুদ্র খামারিও স্বাবলম্বী হতে পারেন। ক্লাইমেট শেড শুধু একটি ঘর নয় এটি একটি টেকসই ভবিষ্যতের ভিত্তি। জলবায়ু পরিবর্তনের এই সময়ে গবাদিপশু পালনে আধুনিক ও জলবায়ু সহিষ্ণু ব্যবস্থা গ্রহণই হতে পারে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের অন্যতম চাবিকাঠি।

তালঝারি কৃষি খামার: বজ্য থেকে শক্তি, শক্তি থেকে সবুজ বিপ্লব

বাংলাদেশের কৃষি খাতে টেকসই উন্নয়নের এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলার তালঝারি কৃষি খামার। “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প” এলডিডিপি’র সহায়তায় এই খামারে গড়ে উঠেছে একটি আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থা, যেখানে ক্ষতিকর বজ্যকে রূপান্তর করা হচ্ছে শক্তি ও সম্পদে।

বজ্য থেকে নবায়নযোগ্য শক্তি

খামার পরিবেশে গরুর গোবর সাধারণত দূষণের একটি বড় উৎস। কিন্তু তালঝারি খামারে এই “সমস্যাকেই করা হয়েছে “সমাধান”। খামারের বায়োগ্যাস প্লান্টে গোবর ব্যবহার করে উৎপাদন করা হচ্ছে মিথেন গ্যাস, যা সংরক্ষণ করে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা হচ্ছে। মাত্র ৪টি গরু থেকেই প্রতিদিন প্রায় ১ ঘনমিটার মিথেন গ্যাস উৎপাদন সম্ভব যা আগে ছিল পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর, এখন তা হয়ে উঠেছে মূল্যবান শক্তির উৎস।

সবুজ শক্তিতে প্রযুক্তির ব্যবহার

এই খামারের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার। সৌরশক্তি ও বায়োগ্যাস এই দুই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে পরিচালিত হচ্ছে কেচো প্রজনন নিয়ন্ত্রণ কক্ষের (worm reproduction control room) কুলিং সিস্টেম। ফলে বিদ্যুতের খরচ কমছে এবং পরিবেশবান্ধব একটি সমাধান নিশ্চিত হচ্ছে।

ভার্মিকম্পোস্ট: মাটির জন্য সেরা উপহার

বায়োগ্যাস উৎপাদনের পর যে বায়ো-স্লারি তৈরি হয় তা ব্যবহার করে উৎপাদন করা হচ্ছে ভার্মিকম্পোস্ট সার। এই সার মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, জলধারণ ক্ষমতা উন্নত করা এবং রাসায়নিক সারের ক্ষতিকর প্রভাব কমাতে অত্যন্ত কার্যকর। বর্তমানে তালঝারি কৃষি খামারে প্রতি মাসে প্রায় ৩০ টন ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদন হচ্ছে-যা নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও অর্গানিক চাষাবাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

পরিবেশ ও কৃষিতে নতুন দিগন্ত

যেখানে গরুর গোবর একসময় পরিবেশ দূষণের কারণ ছিল, সেখানে এখন তা হয়ে উঠেছে বিদ্যুৎ, সার এবং টেকসই কৃষির মূল ভিত্তি। তালঝারি কৃষি খামার প্রমাণ করেছে সঠিক প্রযুক্তি ও পরিকল্পনার মাধ্যমে বজ্যকেও সম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব।

এই উদ্যোগ শুধু একটি খামারের সাফল্য নয়; এটি বাংলাদেশের অর্গানিক কৃষি উন্নয়ন ও পরিবেশ সুরক্ষার অনন্য দৃষ্টান্ত, যা ভবিষ্যতের টেকসই উন্নয়নের পথ দেখাচ্ছে।

শূন্য থেকে সমৃদ্ধি- সফল খামারি শাহিন আক্তারের পথচলা

আকবর পাড়া চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলার একটি গ্রামীণ এলাকা। এই এলাকায় গবাদিপশু পালন প্রচলিত হলেও আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনা, উন্নত খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও রোগ প্রতিরোধমূলক অভিজ্ঞতার অভাবে অনেক খামারি কাক্ষিত লাভ অর্জন করতে পারেন না। বিশেষ করে নারীরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে বড় পরিসরে খামার গড়ে তুলতে সাহস পান না।

শাহিন আক্তারের সংগ্রাম:

শাহিন আক্তারের বিয়ে হয়েছিল একটি সাধারণ কৃষক পরিবারে। তার স্বামী কৃষিকাজ করলেও সংসারের ব্যয় নির্বাহের জন্য আয় ছিল অপ্রতুল। সীমিত আয়ের সংসারে সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি সবসময় দুশ্চিন্তায় থাকতেন। জীবনের প্রয়োজনে ও পরিবারকে সচ্ছল করার স্বপ্ন নিয়ে ২০১৫ সালে তিনি নিজের সব সঞ্চয় বিনিয়োগ করে মাত্র ৩টি গরু নিয়ে খামার কার্যক্রম শুরু করেন।

তবে শুরুটা সহজ ছিল না। গবাদিপশু পালন বিষয়ে তার পর্যাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল না। গরুর খাদ্য ও চিকিৎসা ব্যয় ধীরে ধীরে বেড়ে যাওয়ায় অনেক সময় লোকসানের মুখেও পড়তে হয়েছে। এর মধ্যেই করোনা মহামারী তার জীবনে বড় ধাক্কা নিয়ে আসে। বাজার বন্ধ, চিকিৎসা সংকট ও আর্থিক ক্ষতির কারণে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। তবুও সন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি হাল ছাড়েননি। করোনা পরবর্তী সময়ে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত খামারিদের জন্য নেওয়া ইমারজেন্সি অ্যাকশন প্ল্যান-এর সহায়তা তার জীবনে নতুন আশার আলো জ্বালায়।

প্রকল্পের সাথে যোগাযোগ:

২০২২ সালে শাহিন আক্তারের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় তিনি লোহাগাড়া গরু হস্তপুষ্টিকরণকারী দলের সদস্য হিসেবে যুক্ত হন। ২০২৩ সাল থেকে তিনি নিয়মিত পিজি সদস্য হিসেবে প্রকল্পের বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে থাকেন এবং মোট ১৩টি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। শাহিন আক্তার যেসব উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তা হল: গবাদিপশু পালন পদ্ধতি, প্রাণী স্বাস্থ্য, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, বিজনেস প্ল্যান, ঘাস চাষ, বাজার সংযোগ, খামার ব্যবস্থাপনা। এছাড়াও শাহিন প্রকল্পের মাধ্যমে ঘাস কাটার যন্ত্র ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছেন। হাইজেনিক টুলস হিসেবে পেয়েছেন- ফিড ট্রিলি, বেলচা, ফ্লোরম্যাট, মোটর ইত্যাদি। এইসব উপকরণ তার খামার ব্যবস্থাপনা আরো উন্নত করেছে। প্রকল্পের আওতায় ফ্রি ভ্যাক্সিনেশন এবং কৃমিনাশক প্রদানে তার খামারে কমে আসে রোগ বালাইয়ের প্রাদুর্ভাব।

খামার ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন:

প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ও সহায়তার ফলে শাহিন আক্তার তার খামারে দৃশ্যমান পরিবর্তন

আনতে সক্ষম হন। আগে তিনি শুধুমাত্র কাঁচা ভুট্টার ঘাস খাওয়াতেন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাইলেজের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে জেনে তিনি নিয়মিত ভুট্টার সাইলেজ প্রস্তুত করা শুরু করেন। তিনি শিখেছেন সাইলেজ ও ইউএমএস তৈরির পদ্ধতি, যা তার খামার পরিচালনায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

ঘাস কাটার মেশিন ব্যবহারে তার শ্রম ও সময় সাশ্রয় হয়েছে বহুগুণ। হাইজেনিক টুলস ব্যবহারের কারণে খামার হয়েছে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত। নিয়মিত ভ্যাক্সিনেশন ও কুমিনাশক ব্যবহারে খামার এখন প্রায় রোগমুক্ত। প্রকল্পের পূর্বে ৩টি গরু নিয়ে খামার শুরু করেছিলেন শাহিন, বর্তমানে তার খামারে ষাঁড়, গাভী বাছুর মিলিয়ে ১২টি গরু রয়েছে। ২০২৫ সালের মাঝামাঝি শাহিন ৮টি ষাঁড় গরু বিক্রি করেছিলেন। গরু প্রতি দাম পেয়েছেন ১.২ লক্ষ টাকার ও বেশি। এছাড়াও তিনি গরুর গোবর দিয়ে কেঁচো সার তৈরি করছেন, যা বিক্রি করে অতিরিক্ত আয় করছেন। পাশাপাশি দুধের গরু পালনের মাধ্যমে তিনি লাভবান হচ্ছেন। গরু ছাড়াও ছাগল, মুরগি, কবুতর পালন করে তিনি প্রতিমাসে আয় করছেন। সব মিলিয়ে প্রতি মাসে গড়ে শাহিন আক্তারের আয় ১লক্ষ টাকার বেশি। খরচ বাদ দিয়ে লাভ থাকে ৫০-৬০হাজার টাকা।

বাজার সংযোগ:

শাহিন আক্তারের খামারটি স্থানীয় হাটবাজার ও উপজেলা সদর বাজারের সঙ্গে সংযুক্ত। তিনি স্থানীয় পশু ব্যবসায়ী ও হাটের মাধ্যমে ষাঁড় গরু বিক্রি করেন। ২০২৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে তিনি ৮টি ষাঁড় গরু বিক্রি করেন, প্রতিটি গরু থেকে ১.২ লক্ষ টাকা বা তার বেশি মূল্য পান। এছাড়াও তিনি দুধ স্থানীয় বাজার ও প্রতিবেশীদের কাছে বিক্রি করেন। গরুর গোবর দিয়ে কেঁচো সার উৎপাদন করে স্থানীয় কৃষকদের কাছে বিক্রি করেন। পাশাপাশি ছাগল, মুরগি ও কবুতর পালন করে অতিরিক্ত আয় করেন।

সামাজিক প্রভাব ও নারীর ক্ষমতায়ন:

শাহিন আক্তারের সাফল্য শুধু তার পরিবারেই সীমাবদ্ধ নয়। তার খামারের সাফল্য দেখে আশপাশের অনেক নারী গবাদিপশু পালনে আগ্রহী হচ্ছেন। অনেকেই তার কাছ থেকে পরামর্শ ও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। তিনি এলাকায় একজন সফল নারী উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন, যা নারীর ক্ষমতায়নের একটি বাস্তব উদাহরণ। শাহিন আক্তার একজন উদ্যমী ও প্রতিভাবান খামারি। তার জীবনের গল্পটি শুধুমাত্র তার কঠোর পরিশ্রমের প্রতিফলন নয়, বরং এটি একটি অনুপ্রেরণা, যা আমাদের শেখায় স্বপ্ন দেখার ও তা বাস্তবায়নের গুরুত্ব।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

শাহিন আক্তার ভবিষ্যতে তার খামার আরও সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা করছেন। তিনি গরুর সংখ্যা বৃদ্ধি, দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণ, উন্নত জাতের গাভী সংযোজন এবং কেঁচো সার উৎপাদন বাণিজ্যিকভাবে বিস্তৃত করার চিন্তা করছেন। পাশাপাশি তিনি চান তার অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ গ্রামীণ প্রান্তিক খামারিদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে, যাতে আরও নারীরা স্বাবলম্বী হতে পারেন।

গরু মোটাতাজা করে স্বপ্নপূরণের পথে হেলাল উদ্দিন

গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার ক্ষেত্রে ঘরে ঘরে গরু মোটাতাজাকরণ কার্যক্রম বাংলাদেশে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছে। স্থানীয় চাহিদা পূরণের পর এই ব্যবসা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গরু সরবরাহের সম্ভাবনা উজ্জ্বল করেছে। গবাদিপশুর উৎপাদন বৃদ্ধি এই দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলেছে। গ্রামীণ পরিবারগুলোর অনেকেই এখন বাণিজ্যিকভাবে গরু মোটাতাজা করে প্রতি বছর বিপুল মুনাফা অর্জন করেছে। নারীসহ কিছু দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এই খাতে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। তেমনি বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত সাগর কন্যা পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার আন্ধারমানিক নদীর তীরের মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের অন্য সবার দেখাদেখি হেলাল উদ্দিন একজন গবাদিপশু পালনকারী হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করে যাচ্ছিলেন। কৃষি কাজের পাশাপাশি পরিবার চালাতে গরু মোটাতাজা করার ওপর নির্ভরশীল ছিলেন, কিন্তু পশুর যত্ন ও চিকিৎসার ঘাটতির কারণে যাঁড় উৎপাদন হতো কম, ফলে বাজারে প্রতিযোগিতামূলক দাম পাওয়া যেত না। নিয়মিত রোগবালাই, কৃমি ও পুষ্টিহীনতা ছিল প্রধান চ্যালেঞ্জ। আয় ছিল অস্থির এবং এতে পরিবারে আর্থিক অনিশ্চয়তা লেগেই থাকত।

গরু ক্রয় করা থেকে মোটাতাজা করা পর্যন্ত প্রতি ধাপে ধাপে ব্যবস্থাপনা জানা দরকার। গরুর রোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা, গরুর খাদ্য ব্যবস্থাপনা, গরুর আবাসন ব্যবস্থাপনা। এসব জানা একজন ব্যবসায়ীর খুবই প্রয়োজন কিন্তু হেলাল উদ্দিনের এসব কিছুই জানা ছিলনা, তার কোনো প্রশিক্ষণ ছিল না, তিনি কারও কাছ থেকে পরামর্শও নিতেন না। বছর শেষে শুধু লোকসান হতে থাকে। হতাশ হয়ে পড়েন হেলাল। এক সময় তিনি ভাবলেন, এই ব্যবসা আর করবেন না তখন প্রাণিসম্পদ অফিসারের সাথে আলোচনা করে ২০২৪ সালে “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প” এলডিডিপি’র আওতায় স্থানীয় প্রডিউসার গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত হন। প্রকল্পের পক্ষ থেকে তিনি পেয়েছেন গবাদিপশুর জন্য পুষ্টিকর খাবার, কৃমিনাশক ও টিকা। একইসাথে তিনি আধুনিক গবাদিপশু পালনের প্রশিক্ষণ লাভ করেন, যেখানে পশুর স্বাস্থ্য, খাদ্য পরিকল্পনা এবং বাজার সংযোগ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের সহায়তায় তিনি যাঁড় বিক্রির জন্য স্থানীয় বাজার ছাড়াও বড় বাজারের সাথে যুক্ত হন।

প্রকল্প থেকে সহায়তার পর হেলাল উদ্দিনের খামারে দৃশ্যমান পরিবর্তন আসে। প্রশিক্ষিত হয়ে পশুগুলোর সঠিক যত্ন নেওয়ার ফলে যাঁড় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। আগে

যেখানে বার্ষিক আয় ছিল প্রায় ১,৬৮,০০০ টাকা, এখন তা বেড়ে ৫,২০,০০০-৬,২০,০০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। তিনি এই অতিরিক্ত আয়ের অংশ দিয়ে বাড়িতে একটি ছোট শেড নির্মাণ করেছেন, যাতে প্রাণীদের আরামদায়ক ভাবে রাখা যায়। পূর্বে এনজিও থেকে নেয়া ঋণও তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর সাফল্য দেখে আশপাশের খামারিরাও এলডিডিপি'র সেবা গ্রহণে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন, যা পুরো এলাকায় প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বিক্রি করার পরও এখন তার খামারে ৯টি ষাঁড় আছে।

হেলাল উদ্দিন বলেন, “এলডিডিপি প্রকল্পের সহায়তায় আমি গবাদিপশু পালনের নতুন কৌশল শিখেছি। ভবিষ্যতে খামার আরও বড় করার ইচ্ছে আছে। আমি চাই আমার খামার থেকে আরও বেশি ষাঁড় বাজারজাত করতে। এতে নিজে যেমন লাভবান হব, তেমনি আশপাশের মানুষও উপকৃত হবে।”

টেকসই ও সম্প্রসারণ:

এলডিডিপি প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান ও সহায়তার ফলে হেলাল উদ্দিন এখন নিজের খামারকে টেকসই ভাবে পরিচালনা করছেন। তিনি নিয়মিত পশুর খাদ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বজায় রাখছেন এবং ষাঁড় বিক্রির মাধ্যমে স্থায়ী আয় নিশ্চিত করেছেন। স্থানীয় আরও কয়েকজন খামারি তাঁর কাছ থেকে পরামর্শ নিচ্ছেন এবং আধুনিক পদ্ধতিতে খামার গড়ে তুলছেন। ফলে এই উদ্যোগটি শুধু হেলাল উদ্দিনের নয়, পুরো এলাকার গবাদিপশু খাতে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন ও সম্প্রসারণের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

এলডিডিপি প্রকল্পের সহায়তায় হেলাল উদ্দিন বুঝতে পেরেছেন যে, সফলভাবে খামার পরিচালনার জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ, সময়মত টিকা ও কৃমিনাশক প্রয়োগ, এবং পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ অপরিহার্য। আগে তিনি এলোমেলোভাবে গরু পালন করতেন, কিন্তু এখন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে খাদ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা করছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন পরিকল্পিতভাবে কাজ করলে খামার থেকে উল্লেখযোগ্য আয় করা সম্ভব এবং এভাবে গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী করা যায়।

বিপণন পরিকল্পনা:

কোরবানি ঈদ উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রকল্প শুরু করতে হবে। স্থানীয় পাইকারি ক্রেতাকে অনুসন্ধান করে তার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

একটি আধুনিক স্বাস্থ্যসম্মত গরুর ঘর নির্মাণ করা। যেখানে পর্যাপ্ত আলো বাতাস চলাফেরা করতে পারে। খামারে গরুর সংখ্যা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করা। নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় খাবার তৈরির ব্যবস্থা করা।

ডেইরি খামারি আমজাদ হোসেনের ঘুরে দাঁড়ানো

বিদেশ ফেরত আমজাদের ডেইরি ফার্ম

নোয়াখালী জেলার চাটখিল উপজেলার সাহাপুর ইউনিয়নের প্রসাদপুর গ্রামের মোঃ আমজাদ হোসেন নিজের জীবনের ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় বিদেশ গিয়েছিলেন কিন্তু বিদেশে তার ভাগ্য পরিবর্তন হয়নি ফলে দেশে ফিরে এসে আমজাদ হোসেন নিজ এলাকায় ছোট পরিসরে ৬টি গরু ও বাছুর নিয়ে একটি ডেইরি খামার স্থাপন করেন। শুরুতে খামার পরিচালনার প্রতি তাঁর আগ্রহ থাকলেও পর্যাপ্ত জ্ঞান, প্রশিক্ষণ ও আধুনিক ব্যবস্থাপনার অভাবে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। জনবল সংকট, রোগের প্রাদুর্ভাব এবং সঠিক পরিচর্যার অভাবে খামারের উৎপাদন ব্যাহত হয়। একাধিকবার গাভী ও বাছুর রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ায় তিনি আর্থিক ও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং কয়েক বছর লোকসানের কারণে বাধ্য হয়ে গরু বিক্রি করে দিতে হয়। কিছু সময় এমনও গেছে যখন খামারে একটি গরুও ছিল না। খামার সম্পূর্ণ খালি পড়ে ছিল। জীবিকার অনিশ্চয়তা, পরিবারের ব্যয় নির্বাহের চাপ এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা তাঁকে গভীর হতাশার মধ্যে ফেলে দেয়। তবুও তিনি পুরোপুরি হাল ছাড়েননি। নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর আশায় আবার গাভী পালন শুরু করেন। কিন্তু পুনরায় রোগের প্রাদুর্ভাব, বাজার ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা এবং দুধের ন্যায্যমূল্য না পাওয়ার কারণে আবারও লোকসানের আশঙ্কা দেখা দেয়। স্বল্প আয়ের কারণে পরিবার পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং খামারের আকার বড় করার সুযোগ তৈরি হয়নি।

এই সংকটময় সময়ে আমজাদ হোসেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প” এলডিডিপি’র মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ এর সুযোগ পান। প্রকল্পের মাধ্যমে তিনি আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনা, রোগ প্রতিরোধ, টিকাদান, সুষম খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং উৎপাদন বৃদ্ধি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রাণিসম্পদ অফিসারের নিয়মিত দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ তাঁর আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। তিনি বুঝতে পারেন, সঠিক জ্ঞান ও পরিকল্পনার মাধ্যমে ডেইরি খামার লাভজনকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তিনি নতুনভাবে খামার পরিচালনা শুরু করেন। সঠিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিচর্যার ফলে গরুর রোগের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। একই সঙ্গে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

যেখানে আগে দৈনিক দুধ উৎপাদন ছিল মাত্র ১০-১২ লিটার, বর্তমানে তা বেড়ে ১৭-১৮ লিটারে উন্নীত হয়েছে। খামারের গরুর সংখ্যা ৬টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ২০টি হয়েছে, যা তাঁর খামারের সুস্পষ্ট অগ্রগতির প্রতিফলন। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের সহায়তায় খামার পুনর্গঠনের ফলে আমজাদ হোসেনের মাসিক আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বে যেখানে তাঁর মাসিক আয় ছিল প্রায় ৩০,০০০ টাকা, বর্তমানে তা বেড়ে ৫০,০০০ টাকা হয়েছে।

এই আয় দিয়ে তিনি নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করতে পারছেন এবং পরিবারের ভরণপোষণ আগের তুলনায় অনেক বেশি স্বাভাবিক ও স্বচ্ছল হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে।

আমজাদ হোসেন একজন পরিশ্রমী ও দৃঢ়প্রত্যয়ী ডেইরি খামারি। জীবনের নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে তিনি আজ একটি সফল ও টেকসই ডেইরি খামারের মালিক। তাঁর এই পথচলা “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প”এলডিডিপি’র কার্যকর সহায়তার মাধ্যমে নতুন মাত্রা পেয়েছে।

আমজাদ হোসেনের সামাজিক প্রভাব:

আমজাদ হোসেনের খামারের সাফল্য তাঁর এলাকায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। তাঁকে দেখে অনেকেই নতুন করে ডেইরি খামার স্থাপনে আগ্রহী হচ্ছেন। তাঁর এলাকায় ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি ছোট ও মাঝারি আকারের ডেইরি খামার গড়ে উঠেছে। এলাকার ছোট ছোট খামারিরা তার কাছে বিভিন্ন পরামর্শ গ্রহণ করতে আসেন। আমজাদ হোসেন যে সমস্ত বিষয় নিয়ে খামারিদের মাঝে আলোচনা করেন, তা হল:

- খামার ব্যবস্থাপনা
- খামারের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা
- কোন অসুখে কি ধরনের চিকিৎসা দিতে হবে
- কখন টিকা দিতে হবে
- কি ধরনের খাদ্য দিলে দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

আমজাদ হোসেন বলেন, “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প এলডিডিপি’র মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং প্রাণিসম্পদ অফিসারের নিয়মিত দিকনির্দেশনায় আমার খামারের আকার বড় করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে শুধু আমি নই, এলাকার অনেক খামারিরাও খামার গঠনে আগ্রহী হয়ে উঠেছে”।

বিপণন কার্যক্রম:

আমজাদ হোসেন তার খামারের উৎপাদিত দুধ সরাসরি স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে থাকেন আবার অনেক সময় খামার থেকেও তিনি দুধ বিক্রি করেন। এলাকার রেস্তোরাঁতে নিয়মিত সরবরাহ করে থাকেন।

আমজাদ হোসেনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

আমজাদ হোসেন খামারের কার্যক্রম টেকসইভাবে বজায় রাখতে চান। অর্জিত প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তিনি ভবিষ্যতে খামারের উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করতে চান এবং একটি আদর্শ ডেইরি খামার হিসেবে এটি গড়ে তুলতে চান।

স্কুল মিল্ক কর্মসূচি

স্কুল শিক্ষার্থীদের প্রাণিজ পুষ্টির যোগান

দুধ একমাত্র আদর্শ খাদ্য যার মধ্যে রয়েছে শর্করা, আমিষ, চর্বি, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ এবং পানি। শরীর গঠনে বিশেষ করে দাঁত ও অস্থিকে করে শক্তিশালী, মানসিক স্বাস্থ্য এবং মেধা বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখে যা ফলশ্রুতিতে একটি মেধা ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন জাতি গঠনে অবদান রাখে। উন্নত বিশ্বের তুলনায় বাংলাদেশের মানুষের দুধ পানের পরিমাণ অনেক কম। উন্নত বিশ্বের একজন লোকের মাথাপিছু দৈনিক দুধ গ্রহণের পরিমাণ গড়ে প্রায় ১ লিটারের কাছাকাছি হলেও বাংলাদেশে মাত্র ২৩৯.২৯ মিলিলিটার (DLS stat: 2024-25)। শারীরিক এবং মানসিক বিকাশে দুধের গুরুত্ব অনুধাবন করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়নাধীন “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প” (এলডিডিপি) দুধ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ এবং বাজারজাতকরণে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। দুধের বাজারজাতকরণ এবং দুধ পানের উপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এলডিডিপি প্রকল্প সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্কুল শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিরাপদ ও পুষ্টিকর দুধজাত পণ্য প্রদর্শনীর বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বেসরকারি উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে নিরাপদ দুধজাত পণ্য প্রদর্শনীর ও ভোক্তা সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রকল্পে অর্থায়নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নিরাপদ ও পুষ্টিকর দুধজাত পণ্য গ্রহণের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রদর্শনী কার্যক্রমে অংশগ্রহণে আগ্রহী বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ত করা হবে। এ প্রকল্প থেকে সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে দুধজাত পণ্য গ্রহণের অভ্যাস সৃষ্টি হবে যা পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি ও সরবরাহ কাঠামোতে একটি উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে। এ কার্যক্রম প্রাথমিকভাবে দেশের ৩০০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাইলট আকারে চালুর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় প্রথম পর্যায়ে স্কুল মিল্ক কর্মসূচির আওতায় ৩০০ টি স্কুলে সফল ভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের তরল দুধ পান কর্মসূচির বাস্তবায়নাধীন থাকলেও পরবর্তীতে একই সাথে নতুন ৩০০ টি স্কুলসহ মোট ৬০০ টি স্কুলে প্রকল্প মেয়াদে কর্মসূচি পরিচালিত হয়।

২. স্কুল মিল্ক কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- স্কুল শিক্ষার্থীদের প্রাণিজ পুষ্টির যোগান দেয়া।
- স্থানীয় দুধ উৎপাদনকারীদের দুধ বিক্রয় সহজতর করা।
- বাড়ন্ত বয়সের শিশুদের প্রাণিজ আমিষ গ্রহণের উপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

- দুধ প্রক্রিয়াকরণ কোম্পানিগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে দুধ উৎপাদনকারী দল (পিজি) এবং ভোক্তাদের সাথে সংযুক্ত করা।
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

৩. কর্মসূচির রূপরেখা

- (ক) সুবিধাভোগী স্কুল নির্বাচনঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, কর্তৃক দেশের দারিদ্র মানচিত্র অনুযায়ী সর্বমোট ৬০০ টি স্কুল নির্বাচন।
- (খ) সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীঃ দেশের দরিদ্র এলাকার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত (বিশেষ ক্ষেত্রে তালিকাভুক্ত মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত)। মোট ছাত্র-ছাত্রী: ১,৬১০০৪ জন (ছাত্রী-৫৩%; ছাত্র-৪৭%)
- (গ) দুধ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান/কোম্পানি ও স্কুল বিভাজনঃ “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প” (এলডিডিপি) পিএমইউ কর্তৃক নির্বাচিত দুধ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান যথা- প্রাণ ডেইরি লিঃ-১২৮ টি স্কুল, ব্যাক ডেইরি এন্ড ফুড প্রোডাক্টস (আড়ং ডেইরি)-২০০ টি স্কুল, আকিজ ফুড এন্ড বোভারেজ (ফার্ম ফ্রেশ)-১৪২ টি স্কুল, রংপুর ডেইরি লিঃ (আরডি মিল্ক)-১২৮ এবং মিল্ক ভিটা (শুধুমাত্র পাস্তুরিত তরল দুধ)-০২ টি স্কুল (ঢাকা মহানগর)।
- (ঘ) স্কুল মিল্ক কর্মসূচি বাস্তবায়ন কালঃ মার্চ ২০২৩ খ্রীঃ থেকে আরম্ভ করে প্রকল্প মেয়াদকালীন। প্রতিটি স্কুলে বছরে ক্লাস/পরীক্ষা চলাকালীন খোলা দিনগুলি ও জাতীয় দিবস সমূহে, তালিকাভুক্ত প্রথম ও ২য় পর্যায়সহ মোট ৬০০ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রীকে দুধ খাওয়ানো হয়।

৪. স্কুল মিল্ক কর্মসূচির ব্যবস্থাপনা কাঠামো

সফল ও সুষ্ঠুভাবে ‘স্কুল মিল্ক’ প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাপনা কাঠামো কাজ করে:

(ক) কেন্দ্রীয় স্কুল মিল্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটিঃ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আন্তঃ মন্ত্রণালয় স্কুল মিল্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটি কাজ করে। কমিটির গঠন

১. সচিব মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়-সভাপতি
২. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-কো-চেয়ার
৩. মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর-সদস্য

। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প : সফলতার গল্প

৪. প্রতিনিধি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়-সদস্য
৫. প্রতিনিধি, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর-সদস্য
৬. প্রতিনিধি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-সদস্য
৭. প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার বিভাগ-সদস্য
৮. প্রতিনিধি, দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান-১ জন-সদস্য
৯. প্রকল্পপরিচালক-সদস্য-সচিব কার্যপরিধি
 - স্কুল মিল্ক কর্মসূচি বাস্তবায়নের সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করা;
 - কর্মসূচি বাস্তবায়নে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
 - এ কমিটি সাধারণত: তিন মাস অন্তর সভা আহবান করবে, তবে জরুরী প্রয়োজনে যে কোন সময়ে সভা আহবান করতে পারবে।
 - কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/বিশেষজ্ঞকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

(খ) উপজেলা পর্যায়ে স্কুল মিল্ক কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি

সংশ্লিষ্ট স্কুলে মিল্ক কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য নিম্নরূপভাবে উপজেলা পর্যায়ে স্কুল মিল্ক কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়:

- উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) -সভাপতি
- উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা-সদস্য
- উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা-সদস্য
- প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা-সদস্য
- সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক-সদস্য
- প্রতিনিধি, দুগ্ধ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান-সদস্য
- উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা-সদস্য-সচিব

কার্যপরিধি

- দুধের সরবরাহ নিয়মিত আছে কি-না বা সরবরাহ বন্ধ আছে কি-না তা পরিবীক্ষণ করা।
- স্কুল কর্তৃপক্ষ গাইড লাইন অনুযায়ী দুধ বিতরণ করছে কি-না তা পরিবীক্ষণ করা।
- স্কুলে দুধের প্যাকেটের অপব্যবহার / তহরূপ হচ্ছে কি-না তা নজরদারি করা।
- স্কুল মিল্ক সম্পর্কিত অভিযোগ GRM পদ্ধতি অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা।

- কমিটি প্রতি মাসে বা জরুরী প্রয়োজনে যে কোন সময় সভা আহ্বান করতে পারবে।

গ) উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ):

- বিভাগীয় দপ্তর, জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর নিয়ে এলডিডিপি প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট গঠিত। উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা/ প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা এবং লাইভস্টক ফিল্ড এ্যাসিস্ট্যান্টগণ স্কুল মিক্স কর্মসূচি বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত থেকে বাস্তবায়নে সহায়তা করে।
- উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা প্রাত্যহিক স্কুল মিক্স কর্মসূচি পরিদর্শনের জন্য রাজস্ব ও প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারী সমন্বয়ে একটি পরিদর্শনের সাপ্তাহিক বা মাসিক তালিকা প্রস্তুত করেন সে মোতাবেক স্কুলে দুধ খাওয়ানোর সময় উপস্থিত থেকে কার্যক্রম পরিদর্শন করেন ও প্রাত্যহিক দুধ সরবরাহ হিসাব রেজিস্টারে নির্দিষ্ট ছকপত্রে স্বাক্ষর করেন।
- প্রকল্প পরিচালক বরাবরে বিল দাবীর সময় সংশ্লিষ্ট দুধ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান উক্ত রেজিস্টার মোতাবেক মোট সরবরাহকৃত প্যাকেটের পাক্ষিক/মাসিক হিসাবের টপশীটে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা প্রতিস্বাক্ষর করেন।

ঘ) স্কুল মিক্স কর্মসূচি বাস্তবায়নে জেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ভূমিকা

- সংশ্লিষ্ট জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা- তাদের স্ব-স্ব উপজেলা দপ্তরসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন এ কর্মসূচির তদারকি করেন।
- সংশ্লিষ্ট জেলা কর্মকর্তাগণ উপজেলা/মাঠ পরিদর্শনকালে কর্মসূচি চলমান স্কুল পরিদর্শন, তদারকি ও পরামর্শ প্রদান করেন।
- সংশ্লিষ্ট জেলা কর্মকর্তাগণ মাসিক জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় স্কুল মিক্স কর্মসূচির বিষয়ে অবহিত করেন।

ঙ) স্কুল মিক্স কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিভাগীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ভূমিকা

- সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা- তাদের আওতাধীন জেলা/উপজেলা দপ্তরসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন এ কর্মসূচির তদারকি করেন।
- সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ জেলা/উপজেলা/মাঠ পরিদর্শন কালে কর্মসূচি চলমান স্কুল পরিদর্শন, তদারকি ও পরামর্শ প্রদান করেন।

৫. কর্মসূচি বাস্তবায়ন পদ্ধতি

ক) স্কুল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব

- স্কুলের প্রধান শিক্ষক এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রধান ভূমিকা পালন করা। প্রধান শিক্ষক সংশ্লিষ্ট ক্লাসের শিক্ষককে দুধ বিতরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়োজিত করা। শিক্ষকদের সহায়তায় সরবরাহকৃত দুধের প্যাকেট গ্রহণ, সংরক্ষণ এবং যথাযথভাবে বিতরণের লক্ষ্যে স্কুলের একটি নির্দিষ্ট স্থানে মজুত করা। প্রধান শিক্ষক এ সম্পর্কে একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করা এবং সকল শিক্ষককে তা অবহিত করা।
- প্রতিটি ক্লাসের জন্য একটি স্কুল মিল্ক বিতরণ রেজিস্টার বই সংরক্ষণ করা। মিল্ক বিতরণ রেজিস্টার বইয়ে শিক্ষার্থীদের নাম, পিতা-মাতার নাম ও ঠিকানা, মোবাইল নম্বর লেখা। রেজিস্টার অনুসরণ করে নাম ডেকে দুধের প্যাকেট বিতরণ করা। দুধ বিতরণের পর প্রধান শিক্ষক রেজিস্টারে স্বাক্ষর করা। এর একটি প্রতিলিপি উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা।
- দুধ গ্রহণের সময় প্যাকেট অক্ষত বা ক্ষতযুক্ত কী-না খেয়াল করা এবং রেকর্ড করা।
- প্যাকেটের গায়ে “Milk for School Not for sale” এবং উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ লেখা আছে কী-না তা দেখে দুধ গ্রহণ করা।
- টেট্রাপ্যাকেট ইউএইচটি দুধ অথবা ফুড গ্রোড পলিপ্যাকেট পাস্তুরাইজড দুধ-এর সরবরাহ গ্রহণ করা।
- স্কুল কর্তৃপক্ষ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান/কোম্পানীর নিকট হতে পাস্তুরাইজড প্যাকেটকৃত দুধ প্রতিদিন এবং প্যাকেটকৃত ইউএইচটি দুধ সাপ্তাহিক/পাক্ষিক ভিত্তিতে গ্রহণ করা।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ২০০ মিলিলিটার প্যাকেটকৃত দুধ (ইউএইচটি/পাস্তুরাইজড) বিতরণ করা; কোন প্যাকেট কেউ বাড়ীতে নিতে পারে না।
- দুধ গ্রহণের সময় স্কুল কর্তৃপক্ষকে খেয়াল করা প্যাকেটে দুধ আছে কী-না, প্যাকেট কোন লিকেজ বা ক্ষতিগ্রস্ত আছে কী-না। লিকেজযুক্ত/ক্ষতিগ্রস্ত প্যাকেটের দুধ ছাত্রদের দেয়া হয় না। এ ধরনের প্যাকেট সরবরাহকারীর নিকট ফেরত দেয়া।
- সংশ্লিষ্ট শ্রেণী কক্ষে, সাধারণত: টিফিন পিরিয়ডে দুধ বিতরণ সম্পন্ন করা হয়। সংশ্লিষ্ট শ্রেণী শিক্ষক দুধের প্যাকেটের কোনো কাচি দিয়ে কেটে এর

মধ্যে একটি পাইপ ঢুকিয়ে শিক্ষার্থীদের হাতে দেয়া।

- দুধ বিতরণের পূর্বে শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাওয়া কারা দুধ পানে অগ্রহী এবং অনগ্রহী। অনগ্রহী/অনিচ্ছুক শিক্ষার্থীদের দুধ পানে জবরদস্তি না করা। কোন ছাত্র-ছাত্রীর বিশেষ সমস্যা (যেমন- ল্যাকটোজেন ইনটলারেন্স ইত্যাদি) থাকলে কমিটির সদস্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার প্রত্যয়ন সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- অগ্রহী সকল শিক্ষার্থীদের একসঙ্গে নির্ধারিত সময়ে প্যাকেটের সম্পূর্ণ দুধ পানে উৎসাহিত করা।
- দুধ পান সম্পন্ন হবার পর সকল খালি প্যাকেট সংগ্রহ করে দুধ সরবরাহকারী/প্রতিনিধির নিকট ফেরত দেয়া।
- খালি বা অব্যবহৃত দুধের প্যাকেট পরিত্যক্ত না থাকার বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করা।
- কোন শিক্ষার্থীর দুধ/দুগ্ধজাত পণ্য পানে শারীরিক সমস্যা থাকলে উপজেলা পর্যায়ে স্কুল মিক্স কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা অথবা তার কর্তৃক মনোনীত ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
- দুধ গ্রহণ ও বিতরণ সম্পর্কে রেজিস্টারে রেকর্ড নিয়মিতভাবে সংরক্ষণ করা। দুধ বিতরণ রেজিস্টারে প্রতিদিনের শ্রেণীভিত্তিক দুধ সরবরাহের হিসাব বর্ণিত ছকপত্র মোতাবেক সংরক্ষণ করা যেখানে দুধ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় প্রতিনিধি, প্রধান শিক্ষক ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা/ প্রতিনিধির স্বাক্ষর থাকে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষককে নিশ্চিত করা।

মনজিলা খাতুনের জীবন ও জীবিকার গল্প

সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার বাঙ্গালা ইউনিয়নের বড়ঘোনা গ্রামের মনজিলা খাতুন। সরকারি খাস জমিতে স্বামী সন্তান নিয়ে বসবাস করেন। অভাব তার নিত্য সঙ্গী। সংসারে অভাব অভিযোগ লেগেই থাকত। অভাবের জন্য বিভিন্ন সময় ঋণ দেনায় জর্জরিত হয়ে দিনযাপন করতে হতো। একদিকে পাওনাদারের জুলুম আবার অন্যদিকে অভাব। এতো অভাবের মধ্যেও মনজিলা স্বপ্ন দেখেন। স্বামী, এক ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে চার জনের সংসার। স্বামী অন্যের জমিতে কৃষি কাজ করে আর মনজিলা ঘর গৃহস্থালির কাজের সাথে জড়িত। এলাকায় অন্য সবার মত মনজিলাও হাঁস পালন করে থাকেন, অনেক ধারদেনা করে ৪০টি হাঁস নিয়ে তার ছোট খামার কিন্তু প্রাণিসম্পদ লালন পালনে আধুনিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান না থাকায় হাঁস পালনে লাভের মুখ দেখা মেলেনি। হাঁসের মৃত্যুর হার অনেক বেশি ছিল। ঠিকমত ডিম দিত না, হাঁস পালন নিয়ে মনজিলার যে স্বপ্ন তা আস্তে আস্তে হতাশায় রূপ নেয়।

এলডিডিপি'র সাথে মনজিলা খাতুনের সংযোগ

স্থানীয়দের পরামর্শে ২০২১ সালে মনজিলা খাতুন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প” এলডিডিপি'র ঘোনা হাঁস প্রডিউসার গ্রুপের সদস্য নির্বাচিত হন। এই গ্রুপের সদস্য হয়ে মনজিলা হাঁসের খামারকে কেন্দ্র করে অনেকগুলো প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, সেই সব প্রশিক্ষণ লব্ধ প্রযুক্তিগত জ্ঞান প্রয়োগ করায় তার খামারের হাঁসের মৃত্যু হার অনেক কমে গেছে এবং ডিম উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সে এখন থেকে তার খামারের হাঁসগুলোকে নিয়মিত টিকা ও কৃমিনাশক প্রদান করে থাকেন। এ ব্যাপারে প্রাণিসম্পদ অফিস সহায়তা করে থাকে। পাশাপাশি প্রডিউসার গ্রুপ (পিজি) থেকে প্রাপ্ত হাঁসের খাদ্য পাত্র, পানি পাত্র, হাঁসের খাদ্য ও কৃমিনাশক ঔষধ খামারকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রকল্পের সদস্য হওয়ার পূর্বে তার খামারে মাত্র ৪০-৫০টি হাঁস ছিল আর এখন তার খামারে ৬০০টি হাঁস আছে। প্রতিদিন খামার থেকে ৪৫০টি ডিম পাওয়া যাচ্ছে। আগে মাসিক আয় ছিল ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা কিন্তু বর্তমানে মাসিক আয় ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা।

মনজিলা খাতুন এখন অনেকের কাছে একজন আদর্শ খামারি। নারীদের স্বাবলম্বী হতে হলে প্রথমে হতে হয় আত্মনির্ভরশীল, নিজেকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে হয়। আত্মবিশ্বাসী মনজিলা খাতুন নিজের কঠোর পরিশ্রমে আর

এলডিডিপি'র সহায়তায় আজ একজন সফল হাঁসের খামারি। শুরু থেকে কিছুটা বিপাকে পড়লেও এলডিডিপি'র প্রশিক্ষণ তাকে সাফল্য এনে দিয়েছে। তার সাফল্যে এলাকার ছোট ছোট খামারিরা তার কাছে এসে পরামর্শ নিয়ে যান। তিনি তাদেরকে শেখান শীতকালীন সময়ে কেন বাড়তি যত্ন নিতে হয়, হাঁসের ঘরের তাপমাত্রা কেমন হতে হয়, কি রোগের কি ভ্যাক্সিন নিতে হবে। হাঁসকে কি ধরনের সুষম ও প্রোটিন জাতীয় খাবার দিতে হবে। গ্রামের অনেকেই মনজিলার খামার থেকে ডিম ক্রয় করে বাচ্চা ফুটিয়ে বাচ্চা পালন করে স্বাবলম্বী হয়েছে। মনজিলা খাতুন বলেন, “পিজি হতে ব্যবসা পরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ পাওয়ায় পণ্য বাজার জাত করনের ব্যাপারে ও ব্যবসায় বিনিয়োগের ঝুঁকি সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে পেরেছি”।

সফল নারী মনজিলা খাতুন

খামারের আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় দিনের বেলায় হাঁস চড়ানোর জন্য ৩০ শতকের একটি পুকুর লিজ নিয়েছেন। আগে তার হাঁসগুলো অন্যের পুকুরে চড়ে বেড়াতে যার ফলে মাঝেমাঝে কিছু হাঁস হারিয়ে যেত। বর্তমানে পুকুর লিজ নেওয়ায় হাঁসগুলি সুরক্ষিত আছে। সম্প্রতি বসত বাড়ির পাশে ৬শতক জমি কিনেছেন সেখানে হাঁসের জন্য একটি খামার তৈরি করা হয়েছে। মনজিলা খাতুন বলেন, এসব কিছুই সম্ভব হয়েছে এলডিডিপি'র সহায়তায়। আমার সংসারে আজ সুদিন ফিরেছে। পূর্বের ঋণদেনা পরিশোধ করেছি। ছেলে মেয়েকে লেখাপড়া শিখানোর পাশাপাশি স্বামীকে আর্থিক সহযোগিতা করতে পারছি, আজ আমি মোবাইল এ যোগাযোগ করে ঘরে বসে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারছি। এলডিডিপি আমার জীবনে আশীর্বাদস্বরূপ। এটি আমার জীবন বদলে দিয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

মনজিলা খাতুন এলডিডিপি থেকে যে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন সেই প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে তার হাঁসের খামারটিকে আরও বড় করতে চান।

ছাগল পালনে মাজকুরা বেগমের চমক

স্বামীর স্বল্প আয়ে চলছিলো না মাজকুরা বেগমের সংসার। সন্তানদের নিয়ে বিপাকে পড়ছিলেন তিনি, সংসারে কোনও বাড়তি আয়ও ছিল না তাদের। সন্তানদের লেখাপড়াও ঠিকমত হতো না। অভাবের সংসার এর মধ্যে থেকে মাজকুরা ভাবতে থাকেন বিকল্প আয়ের। কি করে সংসারের বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করা যায়। মাজকুরা বেগম ভাবলেন, তার জন্য সহজ হবে ছাগল পালন, সংসারের অন্য কাজ এর পাশাপাশি তিনি ছাগল পালনে অনেক সময় দিতে পারবেন। মাজকুরা বেগম একজন পরিশ্রমী নারী, প্রাণিসম্পদ নির্ভর জীবিকায় যুক্ত হতে চাওয়া একজন নারী। তার ছাগল পালন করে জীবিকা উন্নয়নের প্রবল ইচ্ছা। শুরুতেই তিনি ৪টি ছাগল নিয়ে তার ছোট আকারের খামার করে ছাগল পালন করতে থাকেন। মাজকুরা বেগমের প্রবল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অর্থসংকট, প্রশিক্ষণের অভাব এবং প্রযুক্তিগত সাপোর্টের ঘাটতির কারণে তিনি তার খামার সম্প্রসারণ করতে পারছিলেন না। তার খামারের ছাগলগুলি প্রায়শ বিভিন্ন রোগে ভুগত, চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা খরচ হত। ছাগলের বৃদ্ধি হতো না, তার এই ছোট খামার নিয়ে মাজকুরা বেগম বিপাকেই ছিলেন। সঠিক পরিকল্পনা ও অভিজ্ঞতার কারণে মাজকুরা বেগম একপ্রকার হাতাশ্রম হয়ে পড়েন। কত আশা নিয়ে তিনি শুরু করেছেন তার স্বপ্নের খামার, তার খামারে ছাগলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, ছাগলের আয় থেকে তার সংসারের অভাব মিটবে, ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার সংকট থাকবে না। তার খামারের এই অবস্থার অন্যতম কারণ মনে করা হয়:

- আধুনিক প্রযুক্তি, রোগবালাই প্রতিরোধ ও মানসম্মত খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ছিল না।
- নিয়মিত রোগব্যাদির কারণে ছাগল মারা যেত, ফলে আয় ছিল খুবই কম ও অনিয়মিত।
- অর্থ সংকট, প্রশিক্ষণের অভাব ও বাজার সংযোগ ব্যবস্থাপনায় দুর্বল ছিল।
- একজন নারী হিসেবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি পিছিয়ে ছিলেন এবং পরিবার-সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন কম ছিল।

এলডিডিপি প্রকল্প এবং মাজকুরা বেগম

পরবর্তীতে মাজকুরা বেগম প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প” এলডিডিপি’র চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার বিদিরপুর গ্রামের

স্থানীয় প্রডিউসার গ্রুপের সদস্য নির্বাচিত হন। তাকে এই প্রকল্পের উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। এলডিডিপি'র অন্তর্ভুক্তির পর তিনি নিম্নে বর্ণিত প্রশিক্ষণ সহায়তা পান:

- আধুনিক ছাগল পালন পদ্ধতি
- খাদ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনা
- প্রজনন ও ছাগল পরিচর্যা
- খামার ব্যবস্থাপনা

প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তিনি প্রকল্প থেকে ক্লাইমেট-স্মার্ট আধুনিক ছাগলের শেড, ভেটেরিনারি ওষুধ, ছাগলের খাদ্য সহায়তা পান। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তি তাঁর জীবনে আত্মনির্ভরতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদনে নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করে। নতুন উদ্যমে মাজকুরা বেগম আবার শুরু করেন তার ছাগলের খামার। তিনি নিজ হাতে ঘাস সংগ্রহ করেন, নিজেই ছাগলের পরিচর্যা করেন। তিনি বিশ্বাস করেন সঠিক পরিকল্পনা ও পরিশ্রম করলে সফলতা পাওয়া যাবে। নিজের সংসারের কাজ, নিজের খামারের কাজ এর পাশাপাশি মাজকুরা বেগম প্রডিউসার গ্রুপের মিটিং এ অংশগ্রহণ করে থাকেন, নিয়মিত চাঁদা প্রদান করে থাকেন, অন্য সদস্যদের সাথে বাজার পরিকল্পনা করে থাকেন। প্রকল্পে যুক্ত হওয়ার পর তার খামারে অভাবনীয় পরিবর্তন আসে-

- ছাগল অসুস্থ হওয়ার হার উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে।
- আধুনিক শেডের কারণে উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে।
- মাসিক আয় দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই ছাগলের খামার থেকে তিনি যে আয় করে থাকেন তা দিয়ে নিজের সংসারের খরচ চালাচ্ছেন, সন্তানদের পড়াশোনার খরচ দিতে পারছেন আবার পাশাপাশি এই আয় দিয়ে ঋণ শোধ করে নিয়মিত সঞ্চয় করছেন।

সূচক	প্রকল্পের পূর্বে	প্রকল্প বাস্তবায়নের পর
ছাগলের সংখ্যা	৪	২০
মাসিক আয়	৯,০০০ টাকা	১৮,৫০০ টাকা
সঞ্চয় দিনে/ মাসে	ছিলোনা	১০০ টাকা

বিদিরপুর গ্রামে মাজকুরা বেগমের প্রভাব

আধুনিক পদ্ধতিতে মাজকুরা বেগম ছাগল পালন করে স্বাবলম্বী হওয়ায় স্থানীয়ভাবে একজন সফল নারী উদ্যোক্তার স্বীকৃতি পেয়েছেন। জীবনের নানা সংকট পার করে

এসেছেন কিন্তু তিনি কারও কাছে হাত পাতেননি, নিজের প্রচেষ্টায় আর এলডিডিপি প্রজেক্টের সহায়তায় তিনি ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। শত বাঁধা বিপত্তিকে পেরিয়ে ছাগল পরিচর্যায় নিয়োজিত থেকেছেন। ছাগল পালন করে নিজের সংসার এর সব দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নিয়েছেন। পুরুষ শাসিত সমাজে মাজকুরা বেগম দেখিয়ে দিলেন কিভাবে জীবনের চাকা সচল রাখতে হয়। ছাগল পালনের লাভের টাকা দিয়ে সন্তানদের লেখাপড়া শেখাচ্ছেন। এলাকার মানুষ তাকে এখন খুব সম্মান করে, প্রশংসা করে, উৎসাহ দেয়। মাজকুরা বেগম বলেন, “কাজ করে খাওয়া অনেক সম্মানের, খুব কষ্ট করে সংসারের সচ্ছলতা এনেছি, প্রকল্প থেকে সহযোগিতা পেয়ে আজ এতদূর আসতে পেরেছি”। মাজকুরা বেগম এখন বিদিরপুর গ্রামের অনুপ্রেরণা। মাজকুরা বেগমের জন্য এখন প্রডিউসার গ্রুপের মাসিক মিটিং নিয়মিত হয়। আগের চেয়ে গ্রুপের সঞ্চয় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস থেকে আধুনিক প্রযুক্তি ও সেবা গ্রহণে গ্রুপ সদস্যরা আরও বেশি সক্রিয়। গ্রুপ সদস্যরা নিজেদের মধ্যে ব্যবসায়িক পরিকল্পনা বাজার সংযোগ নিয়ে আলোচনা করে থাকেন। মাজকুরা বেগমের আধুনিক পদ্ধতির ছাগলের খামার দেখে গ্রামের অনেক মহিলা ছাগল পালনে আগ্রহী হয়ে ছোট ছোট খামার গড়ে তুলেছে। মাজকুরা বেগম নিয়মিত তাদেরকে পরামর্শ প্রদান করেন। ছাগলের কোন রোগের কি টিকা দিতে হবে, কখন টিকা দিতে হবে। ছাগলের বাসস্থান ব্যবস্থাপনা কি ধরনের হবে। ছাগলের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য কি করতে হবে।

একটি টেকসই ছাগলের খামার:

মাজকুরা বেগমের ছাগলের খামারকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাজার ও উৎপাদন ব্যবস্থায় ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ডিএলএস-এর সেবা গ্রহণ ও সেবা প্রদানে সমন্বয় বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক শেড এবং নিয়মিত টিকাদান ব্যবস্থার মাধ্যমে এলাকার প্রাণিসম্পদ খাত আরও উন্নত হয়েছে। রোগ প্রতিরোধে নিয়মিত টিকা, ডিওয়ার্মিং ও পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা হয়েছে। খামারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করা হয়েছে। বাজারের মূল্য ওঠানামা মোকাবিলায় পিজি গ্রুপের মাধ্যমে যৌথ বাজার সংযোগ জোরদার করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: মাজকুরা বেগম ভবিষ্যতে তার খামারে ছাগলের সংখ্যা ৩৫ এ উন্নীত করতে চান, তার খামার এর ব্যবসা আরও বাড়াতে চান। প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান নিয়ে তার ছাগলের খামারটিকে একটি বৃহৎ খামারে পরিণত করতে চান।

শ্যামল হোসেনের উন্নত জাতের ঘাস চাষ

মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল শহরের উত্তর ভাড়াউড়া গ্রামের রিয়াজ উদ্দিন-এর ছেলে মোঃ শ্যামল হোসেন অনেকদিন ধরে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা করার চেষ্টা করছিলেন। কোন দিকেই সাফল্য পাচ্ছিলেন না, যখনই কোনও ব্যবসা করতে শুরু করেন তখনই হোঁচট খান। একরকম হতাশায় পড়েছিলেন এবং পরিশেষে সিলেটের লোকজন সচারাচর যা করেন, বিদেশ যাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু বললেই তো বিদেশ যাওয়া যায়না, টাকা লাগে, কাগজপত্র লাগে, ভিসার অপেক্ষা করা লাগে। এই অপেক্ষার দিন আর শেষ হয়না শ্যামলের। প্রতিদিন এক অনিশ্চয়তার দিন কাটে শ্যামলের।

এলডিডিপিতে যোগদান:

এদিকে শ্যামলদের গ্রামের মধ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প” থেকে একটা প্রডিউসার গ্রুপ গঠন করা হয় যার নাম “উত্তর ভাড়াউড়া ডেইরি পিজি”। বেকার শ্যামল প্রায়ই দেখতেন ঐ পিজি গ্রুপে যারা আছেন তাদের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় প্রতি মাসে গাভী পালন, উন্নত খামার ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন বৃদ্ধি, ব্যবসা পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। শ্যামল এলডিডিপি’র সাথে জড়িত কর্মকর্তা-দের সাথে যোগাযোগ করে এবং “উত্তর ভাড়াউড়া ডেইরি পিজি”-তে যোগ দিয়ে গাভী পালন করে নিজের ব্যবসা শুরু করার আগ্রহ দেখায়।

কিন্তু জায়গা খালি না থাকায় শ্যামল ঐ পিজির সদস্য হিসেবে ঢুকতে পারেনি কিন্তু তার ইচ্ছা দমে যায়নি। শ্যামল শুরু করলেন গাভী ও মহিষ পালন পাশাপাশি শ্রীমঙ্গল উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে নিয়মিত যোগাযোগ করতে থাকে। অবশেষে এলডিডিপি থেকে যখন পিজির সদস্য সংখ্যা ৪০ জনে করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তখন মোঃ শ্যামল উত্তর ভাড়াউড়া পিজি গ্রুপে যোগ দেন। যোগদানের আগে মোঃ শ্যামল হোসেন এর ০৩ টি দেশী গাভী ও ০৭ টি মহিষ ছিল। দেশী গাভীগুলো থেকে দুধের উৎপাদন খুব বেশি ছিল না। তাছাড়া গাভীর আবাসস্থল স্বাস্থ্যসম্মত না থাকায় গাভীগুলি প্রায়ই অসুস্থ থাকতো। গাভীকে খাওয়ানোর জন্য পর্যাপ্ত ঘাসের সরবরাহ ছিল না।

শ্যামলের জীবনে নতুন অধ্যায়:

পিজি-তে যোগদানের পর শ্যামল ০৮ টি এলএফএসএস প্রশিক্ষণ, উত্তম চর্চার

প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজের খামার ব্যবসা শুরু করেন। তাছাড়া এক্সপোজার ভিজিট, ভ্যাক্সিনেশন, ডি-ওয়ার্মিং, মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক সেবা গ্রহণ ও এলইও/এলএফএ/এলএসপিদের নিয়মিত খামার পরিদর্শন। পিজি গ্রুপে যোগদানের পরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও প্রকল্পের পরামর্শে ঘাসের পুটে উন্নত জাতের ঘাস চাষ শুরু করেন। নিজের খামারের ঘাসের চাহিদা পূরণ করে বাইরে ঘাস বিক্রি করে খামারের পাশাপাশি ঘাসের ব্যবসা করতে শুরু করেন। বর্তমানে গ্রামটির সবাই জানে এই গ্রামের উন্নত জাতের ঘাস চাষি মোঃ শ্যামল হোসেন। শ্যামলের এখন দিন কাটে ঘাসের মাঠে। এই ঘাস চাষ তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। তিনি নিজ হাতেই ঘাসের চারা রোপণ করেন, ঘাসের নিড়ানি দেন আবার মাঠ থেকে নিজেই ঘাস সংগ্রহ করে আটি ভর্তি করে বিক্রি করেন। এক সময় এই শ্যামল অনেক ব্যবসায় লোকসান দিয়ে যখন অনিশ্চিত এক জীবনের মুখোমুখি তখন এলডিডিপি তাকে দেশের ভিতর এক সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ এর স্বপ্ন দেখান। এই ঘাস চাষ করে শ্যামল বছরে ৯০,০০০-১০০,০০০/- টাকা আয় করে। পাশাপাশি দুধ উৎপাদন থেকেও বছরে ৭০,০০০/- থেকে ৭৫,০০০/- হাজার টাকা আয় হয়।

সূচক	প্রকল্পের পূর্বে	প্রকল্প বাস্তবায়নের পর
ঘাস চাষের জমির পরিমাণ	৩ বিঘা	১২ বিঘা (৯ বিঘা লিজ)
ঘাস বিক্রি করে আয় (বছরে)	২৫,০০০ টাকা	৯০,০০০-১০০,০০০ টাকা

শ্যামল বলেন “আমার ০৩ কেয়ার জমিত আমি ঘাস চাষ করিয়া নিজর গরুরে খাওয়াইতাম আর কিছুটা বেচতাম। পরে আমি দেখলাম, বহুত মানুষ গরুর লাগি উন্নত ঘাস না পাইয়া ইতা লোকাল ঘাস খাওয়াইন। এর লাগি তারা দানাদার খানি বেশি খাওয়াইন আর গরু-এ খুব বেশি দুধ দেইন না। তাছাড়া আমার এলাকাত কেউ ঘাসও বেচইন না, শ্রীমঙ্গল শহরও কেউ বেচইন না। এর ফর থাকি আমি ব্যবসার লাগি ঘাস চাষর কথা চিন্তা করা শুরু করি এবং ৯ বিঘা জমি লিজ লইয়া মোট ১২ বিঘাত জার্মান, নেপিয়র পাকচুং ঘাস চাষ করার সিদ্ধান্ত লই”।

শ্রীমঙ্গল উপজেলা তথা সিলেট বিভাগের সকল জেলা এবং উপজেলায় ঘাসের সংকট বিদ্যমান। অনেক বড় বড় খামারি নিজের খামারের প্রয়োজনে ঘাস চাষ করলেও মাঝারি ও ছোট খামারিরা ঘাসের সংকটে ভোগে এবং এর ফলে তারা দানাদার খাদ্যের উপর নির্ভরশীল থাকে। ফলে খামার লাভ করতে না পারার কারণে অনেক খামার বন্ধ হয়ে যায়। শ্যামল ঠিক এই জায়গায় হাত দিয়ে মাঝারি ও ক্ষুদ্র খামারি তথা নিজের ব্যবসার প্রসার ঘটিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য দেখিয়েছেন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সম্পর্কে শ্যামল বলেন “ভুট্টার সাইলেজ বলে গাভীর দুধ উৎপাদন বাড়াইন। এর লাগি ইটা করার চিন্তা-সহ আমার খামারের লাগি আরও ০৩ টা ফ্রিজিয়ান জাতের গাই কিনার চিন্তা আছে”। এলাকার সমস্ত খামারিদের ঘাসের চাহিদা পূরণ করতে চান।

বিপণন কৌশল:

স্থানীয় ছোট ছোট দুগ্ধ খামারিদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন কারণ তারাই শ্যামলের প্রধান গ্রাহক। সহজে বহনযোগ্য করার জন্য ঘাস কেটে ছোট ছোট আঁটি বেধে সরবরাহ করেন।

যুগের উপযোগী খামারি শ্যামল হোসেন:

শ্যামল হোসেন ঘাস চাষ করার জন্য উঁচু জমি নির্বাচন করেছেন, যার ফলে জমিতে পানি জমে না। তিনি নিয়মিত জমিতে আগাছা পরিষ্কার করে থাকেন। আধুনিক চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করেন। তার নিজের খামার থেকে গোবর সার জমিতে ব্যবহার করেন। পরিকল্পিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ঘাস চাষ করে শ্যামল হোসেন অল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে এলাকার একজন সফল ঘাস ব্যবসায়ী।

দুধ খামারি ছাব্বির উল্লাহর সাফল্য

জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলার নয়ানগর ইউনিয়নের বানিপুকুরিয়া গ্রামের মোঃ ছাব্বির উল্লাহ। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে নয়ানগর ইউনিয়ন। এই অঞ্চল নদী ও হাওড় দিয়ে বেষ্টিত।

নদী ও হাওড়কে কেন্দ্র করে এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা। কৃষি নির্ভর এই অঞ্চলের মানুষ গবাদিপশু লালন পালন করে থাকে দীর্ঘকাল থেকে। বানিপুকুরিয়া গ্রামের মোঃ ছাব্বির উল্লাহ একজন সফল দুধ খামারি। একদিনে তিনি সফল হন নাই। কয়েক বছর আগেও ছাব্বিরউল্লাহর কিছুই ছিল না, বর্গাচাষী বাবার সন্তান ছাব্বিরউল্লাহ বাবার সাথে কৃষিকাজে সহায়তা করতেন।

বসতিভিটা ছাড়া তাদের আর কিছুই ছিল না। অনেক অভাবের সংসার, তার বাবার পক্ষে সংসার চালানো খুবই কষ্টকর ছিল মন খারাপ করে ছাব্বিরউল্লাহ বাবার সাথে বর্গাজমিতে কৃষিকাজ করতেন। এভাবেই চলছিল বাবা সন্তানের দৈনিক জীবন। তখন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার পরামর্শে সত্তর হাজার টাকা দিয়ে একটি বকনা বাছুর ক্রয় করেন এরপর তিনি আরও কয়েকটি গরু ক্রয় করে লালন পালন শুরু করেন কিন্তু আশানুরূপ ভাল ফল পাচ্ছিলেন না। আজ এ গরুর অসুখ তো কাল ও গরুর অসুখ লেগেই আছে। মাস শেষে গরুর পিছনে অনেক টাকা খরচ হয়ে যায়।

এলডিডিপি সংযোগ

এই হতাশার মধ্যে তখন ছাব্বিরউল্লাহ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প এলডিডিপি'র মাধ্যমে মালঞ্চ ডেইরি প্রডিউসার গ্রুপের সদস্য হন। গ্রুপের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর এলডিডিপি প্রকল্প থেকে নিম্নলিখিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন:

১. খামারি প্রশিক্ষণ
২. আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার (সাইলেজ, ইউরিয়া, মোলাসেস স্ট্র, বায়োগ্যাস প্লান্ট)
৩. ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন
৪. বাজার সংযোগ
৫. গ্রাস চপার মেশিন ব্যবহার

৬. দুধের বহুমুখী ব্যবহার

৭. গবাদিপশুর জন্য সুস্বাদু খাদ্য তৈরি প্রশিক্ষণ

৮. হাইড্রোফনিক পদ্ধতিতে ঘাস উৎপাদন প্রশিক্ষণ

৯. খামার ব্যবস্থাপনা

এ ছাড়াও বিভিন্ন মাঠ দিবসের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, নেপিয়ার জাতের ঘাসের কাটিং সংগ্রহ, মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিকের মাধ্যমে নিয়মিত সেবা গ্রহণ করে থাকেন।

ছাকিরউল্লাহর বদলে যাওয়া জীবন:

এই সহায়তার মাধ্যমে বদলে যেতে থাকে ছাকিরউল্লাহর দিন। এলডিডিপি'র প্রডিউসার গ্রুপের সদস্য হওয়ার আগে ছাকিরউল্লাহ খামারে গরুর সংখ্যা ছিল ১২টি। বর্তমানে তার খামারে মোট ৩২টি গরু রয়েছে, যার বাজার মূল্য প্রায় ৫৯,০০,০০০ টাকা। এই খামারে দৈনিক দুধ উৎপাদন প্রায় ১০০-১২০ লিটার যার বাজার মূল্য ৬০০০ থেকে ৭২০০ টাকা। তিনি দুধ বিক্রি করে মাসে ১,৮০,০০০ থেকে ২,১৬,০০০ টাকা আয় করেন।

সূচক	প্রকল্পের পূর্বে	প্রকল্প বাস্তবায়নের পর
গরুর সংখ্যা	১২	৩২
গড় দুধ উৎপাদন (লিটার/গাভী/দিন)	৫	১২
মাসিক গড় আয় (গাভী প্রতি)	৯,০০০ টাকা	২১,০০০ টাকা

একজন আদর্শ খামারির তার খামারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো:

উন্নত বাসস্থান: গবাদি প্রাণীর জন্য পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচলকারী, উঁচু, শুকনো এবং পরিষ্কার বাসস্থান।

সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: খামারের মলমূত্র ও বর্জ্য দ্রুত অপসারণ এবং পচনশীল বর্জ্য দিয়ে জৈব সার তৈরির ব্যবস্থা।

উন্নত খাদ্য ও পানি: পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাবার এবং সবসময় বিশুদ্ধ পানির প্রাপ্যতা।

স্বাস্থ্যসেবা: খামারের গাভীর জন্য নিয়মিত টিকাদান, রোগ শনাক্তকরণ এবং চিকিৎসার জন্য পশু চিকিৎসকের পরামর্শ।

নয়নাগরের ছাকিরউল্লাহ তেমনই একজন আদর্শ খামারি। তার খামারের মাধ্যমে এলাকার এবং নিজের পরিবারের আমিষের চাহিদা পূরণ করেন। আবার গরু থেকে প্রাপ্ত গোবর ফেলে না দিয়ে বায়োগ্যাসের মাধ্যমে তার পরিবারের জ্বালানির চাহিদা

পূরণ করেন। ঘাস গো-খাদ্যের একটি অন্যতম উপাদান, উন্নত জাতের কাঁচা ঘাস এলাকায় অপ্রতুল সহজে পাওয়া যায় না। তাই প্রাণিসম্পদের মাধ্যমে তার ব্যবসার মুনাফা দিয়ে দুই বিঘা জমিতে উন্নত জাতের ঘাস উৎপাদন করতে সমর্থ হয়েছেন। খামারের জন্য একটি চপার মেশিন ক্রয় করেছেন যা তার খামার পরিচালনা করায় সাহায্য করেছে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘাসের যোগান দিতে সক্ষম হয়েছে। সফল খামারি মোঃ ছাকিরউল্লাহ বলেন, “আগে যেখানে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি জ্ঞান, প্রশিক্ষণ, প্রকল্পের বিভিন্ন উপকরণের অভাবে দুধ সংরক্ষণ বা দুধের ন্যায্যমূল্য পেতাম না, কিন্তু এখন এ প্রকল্পের সহায়তা প্রাপ্তির পর আয়ও দ্বিগুণ হয়েছে। গাভীর বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে জানতে পেরেছি, কোন কোন রোগের কি কি ভ্যাক্সিন সেই সম্পর্কে এখন সম্যক ধারণা প্রাপ্ত হয়েছে। আমার খামারে রোগ বালাই এখন অনেক কম, গাভীকে পুষ্টিসম্মত খাবার দেওয়ায় দুধের উৎপাদন বেড়েছে সেই সাথে গাভীর গর্ভধারণ ক্ষমতা আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে”।

ছাকিরউল্লাহ ও সম্প্রসারণ প্রযুক্তি:

ছাকিরউল্লাহ আশেপাশের কয়েক গ্রামের খামারিদের জন্য আদর্শ খামারি হিসাবে পরিচিত পেয়েছেন। তাকে দেখে অনেকেই উন্নত জাতের গাভী পালন ও উন্নত জাতের ঘাস চাষের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। প্রকল্পের সহায়তায় ছাকিরউল্লাহ সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন এর মাধ্যমে এলাকার ছোট ছোট খামারিদের নিজস্ব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখেন। তিনি নিজে যেমন তার খামারে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করেন তেমনি অন্য খামারিদের দ্রুত বর্ধনশীল এবং রোগ প্রতিরোধী জাতের গাভী কিনতে উৎসাহী করেন। খাদ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে খামারিদেরকে সচেতন করে তোলেন।

বাজার ব্যবস্থাপনা:

ছাকিরউল্লাহ একজন আদর্শ খামারি। তিনি তার খামারের উৎপাদিত দুধ সরাসরি ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেন। সময়মত উৎপাদন, দ্রুত পরিবহন ব্যবস্থা এবং চাহিদা অনুযায়ী দুধ সরবরাহ তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্থানীয় পাইকারি ও খুচরা বাজারের সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে উৎপাদিত দুধ তিনি পার্শ্ববর্তী স্থানীয় বাজারে, মিষ্টির দোকানে বিক্রি করে থাকেন।

একজন সফল নারী উদ্যোক্তা আফরোজা খাতুন

আফরোজা খাতুন এক সাহসী নারী খামারি। রাজশাহী জেলার বাঘমারা উপজেলার মাড়িয়া ইউনিয়নের এক প্রত্যন্ত গ্রামে তার বসবাস। তার গ্রামের নাম বামনকয়া। এই গ্রামটি কয়েকটি বিল দিয়ে বেষ্টিত। আফরোজা খাতুন ছিলেন একজন সাধারণ গৃহিণী। তার স্বামী বেকার হওয়ায় সংসারের ব্যয় নির্বাহ ছিল কঠিন। সংসারে অভাবের সুর একটানা বেজেই চলত। যদিও ঘরের আঙিনায় ছোট বড় মিলিয়ে অনেকগুলো গাভী থাকলেও পর্যাপ্ত পুঁজি ও প্রশিক্ষণের অভাবে দুধ বিক্রির মধ্যেই তার কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিল। অল্প দুধ বিক্রির অর্থে পরিবারের মৌলিক চাহিদা মেটানোই ছিল প্রধান চ্যালেঞ্জ। ভাল চিকিৎসার অভাবে গরুগুলো ছিল কঙ্কালসার, পর্যাপ্ত দুধ দিত না। বাজারে গোখাদ্যের অনেক দাম। যেখানে সংসার চালানোই কষ্টসাধ্য সেখানে খামার চালানো বিলাসিতা ছাড়া কিছুই না। কিন্তু আফরোজার ছিল প্রচণ্ড সাহস, সে নিজের ভাগ্য নিজেই লিখতে চেয়েছিল। তিনি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ শুরু করেন। সেখান থেকে বিভিন্ন পরামর্শ নিতে থাকেন। ২০২৪ সালে “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প” এলডিডিপি’র মাধ্যমে বামনকয়া ডেইরি প্রডিউসার গ্রুপ (পিজি)’র সদস্য নির্বাচিত হন। প্রকল্পের সহায়তায় তিনি-

- দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন,
- ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য তৈরির জ্ঞান অর্জন করেন,
- বাজার সংযোগ ও বিক্রয় কৌশল বিষয়ে দিকনির্দেশনা পান।

প্রকল্পের নিয়মিত সভা, আলোচনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে তিনি আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন এবং ঘি, মাঠা ও চিজ উৎপাদন শুরু করেন। একসময় সংসারের হাল ধরতে গিয়ে আর্থিক সংকটে পড়া আফরোজা খাতুন আজ একজন সফল নারী উদ্যোক্তা। বামনকয়া ডেইরি প্রডিউসার গ্রুপ (পিজি)’র সদস্য হিসেবে এলডিডিপি প্রকল্পের সহায়তা পেয়ে তিনি ঘি, মাঠা ও চিজ উৎপাদনে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। তার পণ্য এখন স্থানীয় বাজারে ব্যাপক জনপ্রিয় এবং তিনি এলাকার নারীদের জন্য অনুপ্রেরণার প্রতীক হয়ে উঠেছেন। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির আগে আফরোজা প্রতিদিন ২০-৩০ লিটার দুধ বিক্রি করতেন, মাসে আয় হতো গড়ে ৮,০০০-১০,০০০ টাকা। বর্তমানে তিনি প্রতিদিন ২৫০-৩০০ লিটার দুধ ব্যবহার করে ঘি, মাঠা ও চিজ তৈরি করছেন।

সূচক	প্রকল্পের পূর্বে	প্রকল্প বাস্তবায়নের পর
দুধ বিক্রি (দিনে)	২০-৩০ লিটার	২৫০-৩০০ (লিটারের দুগ্ধজাত পণ্য)
মাসিক আয় (টাকা)	৮,০০০-১০,০০০ টাকা	১৫০,০০০-২০০,০০০ টাকা

আফরোজা খাতুন তার খামার থেকে দুগ্ধজাত পণ্য বিশেষ করে ঘি উৎপাদনে তিনি স্থানীয় বাজারে ব্র্যান্ড গড়ে তুলেছেন। পাশাপাশি উৎপাদনে স্থানীয় নারী কর্মীদেরও সম্পৃক্ত করেছেন। তার পরিবারে আর্থিক সচ্ছলতা এসেছে এবং সন্তানদের শিক্ষায় ব্যয় করতে পারছেন।

বাজার সংযোগ

আফরোজা খাতুন তার পণ্য বিশেষ করে চিজ ক্রেতাদের আকর্ষণ করার জন্য মোড়কজাত করে বিক্রি করে থাকেন। বাজার সংযোগের জন্য তিনি পিজি গ্রুপের সাথে নিয়মিত আলোচনা করে থাকেন। স্থানীয় বাজারে সরবরাহ নিশ্চিত করে থাকেন। পিজি গ্রুপের সভায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করে নতুন নতুন বাজারের সন্ধান পেয়ে থাকেন। অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে পণ্যের মানোন্নয়ন ঘটান। যার ফলে পিজি সদস্যদের মধ্যে বাজার সংযোগ ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আফরোজা খাতুনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

আফরোজা ভবিষ্যতে নিজস্ব ব্র্যান্ডে প্যাকেটজাত চিজ ও মাঠা বাজারজাত করার পরিকল্পনা নিয়েছেন। আফরোজা বলেন, “দৃঢ় মনোবল আর চরম ইচ্ছাশক্তির সাথে এলডিডিপি প্রকল্পের প্রশিক্ষণ আমাকে এগিয়ে দিয়েছে সাফল্যের চরম শিখরে। এখন আমি শুধু পরিবারের জন্য উপার্জন করছি না, বরং এলাকার নারীদেরও দেখাচ্ছি স্বপ্ন দেখলে তা পূরণ করা যায়।”

অন্য আফরোজা খাতুন

তার সাফল্যে এলাকার অন্যান্য নারীও দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণে আগ্রহী হচ্ছেন। আফরোজার কারণে স্থানীয়ভাবে নারী উদ্যোক্তা তৈরির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু আফরোজা এখন স্থানীয় বাজারে নিয়মিত সরবরাহকারী ফলে পিজি সদস্যদের মধ্যে ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। আফরোজা মনে করেন, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে নারী উদ্যোক্তারা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারেন। দুধের ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য উৎপাদন দারিদ্র্য বিমোচনের টেকসই উপায় হতে পারে। একটি প্ল্যাটফর্ম নারীদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও ব্যবসায়িক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

মিষ্কিং মেশিন ও রেজাউল করিম

উত্তরাঞ্চলের প্রবেশপথ সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার খালিয়পাড়া গ্রামের মোঃ রেজাউল করিম। স্ত্রী আর দুই সন্তান নিয়ে একটি ছোট সংসার তার। অনেক আশা অনেক স্বপ্ন নিয়ে একটি খামার করবেন বলে ২০১৮ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার তালগাছী এবং পাবনা জেলার ভাঙ্গুরা উপজেলা ও বেড়া উপজেলা হতে ৩ মাস ঘুরে ১২টি ফ্রিজিয়ান ও ৩টি জার্সি বকনা এই মোট ১৫টি বকনা দিয়ে খামার শুরু করেন।

খামার শুরুর প্রথম দিকে আধুনিক প্রযুক্তি এবং খামার ব্যবস্থাপনার বিষয়ে রেজাউলের কোনও দক্ষতা ছিলনা। খামারে বিভিন্ন রকম রোগবালাই লেগেই থাকতো। নিয়মিত টিকা প্রদান এবং কৃমিনাশক প্রদানের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না। জানতেন না কি করে খামারে সঠিক ভাবে খাদ্য ব্যবস্থাপনা দ্বারা খামার লাভজনক করা যায় এবং গবাদি পশুকে সুস্থ রাখা যায়, অপ্রয়োজনীয় খাদ্য খরচ কমানো যায়। রেজাউল করিম দিনের পর দিন চিন্তিত হয়ে পড়েন মাস শেষে খামারে লাভের পরিমাণ কমতে থাকে। তিনি খামার চালাতে অগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। ইতোমধ্যে করোনা মহামারীর সময় আরও খারাপ অবস্থা শুরু হয়।

করোনাকালীন সময়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প হতে নগদ আর্থিক প্রণোদনা পান এবং ২০২১ সালে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে এলডিডিপি প্রকল্পের বাঁখুয়া ডেইরি পিজির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হন। প্রকল্পের মাধ্যমে তিনি সাইলেনজ প্রযুক্তি, ইউএমএস, টিএমআর, উন্নত জাতের ঘাস চাষ, জলবায়ু সহিষ্ণু আবাসন ব্যবস্থা, ভার্মি কম্পোস্ট, বায়োগ্যাস এই সমস্ত প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এসব প্রশিক্ষণ হতে প্রাপ্ত জ্ঞান তিনি খামারে প্রয়োগ করেন। ফলে খামারে বাছুরের মৃত্যু হার কমে এবং গাভীর দুধ উৎপাদনের পরিমাণ অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ট্রেনিং পরবর্তী সহযোগিতা হিসাবে তিনি প্রকল্প থেকে পেয়েছেন একটি মিষ্কিং মেশিন, টেম্পারেচার হিউমিডিটি মিটার, দুধের ক্যান, গো খাদ্য, টিট ডিপিং কাপ, গাম বুট ও কৃমিনাশক ঔষধ।

একটি মিষ্কিং মেশিন রেজাউল করিমের খামারটিকে সমৃদ্ধ করে তোলে। মিষ্কিং মেশিন হলো এমন একটি যন্ত্র যা গরু, মহিষ বা অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণী থেকে সয়ংক্রিয়ভাবে দুধ দোহন করতে ব্যবহৃত হয়, যা ভ্যাকুয়াম চাপ ও টিট কাপের সাহায্যে বাছুরের প্রাকৃতিক চোষার প্রক্রিয়াকে অনুকরণ করে দুধ বের করে আনে, | প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প : সফলতার গল্প

ফলে দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে বেশি সংখ্যক পশুর দুধ দোহন করা যায়। স্বাস্থ্যকর পদ্ধতিতে দুধ সংগ্রহ হওয়ায় দুধের গুণগত মান ভালো থাকে। খামারের উৎপাদনশীলতা ও লাভ বাড়াতে সাহায্য করে। সময় বাঁচে এবং খামারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

মোঃ রেজাউল করিম বলেন, “এলডিডিপি হতে প্রাপ্ত মিল্কিং মেশিন দ্বারা দুধ দোহনের ফলে সময় অপচয় কম হচ্ছে এবং আগে দুধ দোহনের লোককে যে টাকা দেয়া লাগত সেটাও আর দেয়া লাগে না। এছাড়া এর ফলে গাভীগুলোতে ম্যাসটাইটিস হওয়ার হার অনেক কমে গেছে। এলডিডিপি হতে প্রাপ্ত টেমপারেচার হিউমিডিটি মিটার দেখে দিনের বিভিন্ন সময় খামারের তাপমাত্রা সম্পর্কে জানতে পারি এবং সঠিক ব্যবস্থা নিতে পারি। ফলে অতি গরমেও দুধের উৎপাদন হার স্থিতিশীল আছে। পাশাপাশি এলডিডিপি হতে প্রাপ্ত দুধের ক্যান, গো খাদ্য, টিট ডিপিং কাপ, গাম বুট, ও কৃমিনাশক ঔষধ আমার খামারকে সমৃদ্ধ করেছে”।

প্রকল্পের সদস্য হওয়ার পূর্বে রেজাউলের খামারে গাভী ছিল ১৫টি, বাছুর ছিল ৮টি আর বকনা ছিল ৫টি। খামার থেকে মাসিক আয় ছিল ৬০,০০০/- টাকা। বর্তমানে গাভী ৪০টি, বাছুর ২৫টি আর বকনা ৫টি। এখন মাসিক আয় ১৫০০০০/- টাকা (প্রতিদিন গড় দুধ হয় ৩০০লিটার*৬৫টাকা) =১৯,৫০০/-টাকা। খামারে ৫ জন কর্মচারী আছে। যাদের প্রত্যেকের বেতন ১৬০০০/- টাকা। তিনি ১৭ বিঘা জমিতে ঘাসের চাষ করে থাকেন।

সূচক	প্রকল্পের পূর্বে	প্রকল্প বাস্তবায়নের পর
গাভীর সংখ্যা	১৫	৪০
বাছুরের সংখ্যা	৮	২৫
বকনার সংখ্যা	৫	৫
দৈনিক দুধ উৎপাদন	১৩ লিটার	৩০০ লিটার
খামারে কর্মচারীর সংখ্যা	২	৫
মাসিক আয়	৬০,০০০ টাকা	১৫০,০০০ টাকা
মাসিক সঞ্চয়	০ টাকা	৫০০ টাকা

এখন রেজাউল করিম নিয়মিত পিজি মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করে থাকেন। সকল সদস্য রেজাউলের অনুপ্রেরণায় প্রতিমাসে সঞ্চয় হিসাবে ৫০০/- টাকা করে জমা করে থাকেন। সঞ্চয় অর্থ ভবিষ্যতে প্রয়োজনে ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারবেন।

প্রকল্প থেকে অর্জিত জ্ঞান খামারকে যেমন উন্নত করেছে তেমনি রেজাউলের সফলতা দেখে আশেপাশের কিছু খামারি উদ্বুদ্ধ হয়েছে। তারাও তাদের খামারে জীব নিরাপত্তা ও সুস্বাদু খাদ্য সরবরাহের মত প্রযুক্তিগুলো অনুসরণ করেছে। ঘাসের জমি থেকে ঘাসের কাটিং নিয়ে তারা ঘাসের পুষ্টি তৈরি করেছে।

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে রেজাউল করিম বলেন, “আমি আমার খামারকে ভবিষ্যতে আরও বড় করতে চাই, এলডিডিপি প্রশিক্ষণ হতে প্রাপ্ত জ্ঞান আমি আমার খামারে প্রয়োগ করে খামারে পশুর নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে চাই। এখন আমার খামারের প্রতিটি গাভী উন্নত জাতের এবং এর ধারাবাহিকতায় প্রতিটি গাভীর নূন্যতম দুধ উৎপাদন ১৭ লিটার। এলডিডিপি প্রকল্প আমার জীবনে আশীর্বাদস্বরূপ। এটি আমার জীবনকে বদলে দিয়েছে। এজন্য আমি এলডিডিপি’র কাছে কৃতজ্ঞ”।

বাজারজাতকরণ ও সম্প্রসারণ:

রেজাউল করিম মনে করেন, স্থানীয় বাজারের পাশাপাশি বড় বায়ারের কাছে সরাসরি দুধ বিক্রি করলে ব্যবসায় টিকে থাকার সম্ভাবনা প্রবল। খামারের কর্মচারীদের ডেইরি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে একটি আধুনিক খামার গড়ে তুলে বাজার সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারলে এই ডেইরি বাজারে টিকে থাকা সম্ভব।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

রেজাউল করিম তার এই খামারকে কেন্দ্র করে অনেক পরিকল্পনার স্বপ্ন বুনে চলেছেন। তিনি পর্যায়ক্রমে তার খামারে উচ্চ উৎপাদনশীল গাভীর সংখ্যা বাড়াতে চান। বিপণন ব্যবস্থায় আরও মনোযোগ বাড়াতে চান। পুষ্টি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় একটি আধুনিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে চান।

সাফল্যের পথে অঞ্জনা বড়ুয়া

কক্সবাজার জেলার রম্যভূমি রামু উপজেলার রাজারকুল ইউনিয়নের পূর্ব রাজারকুলের অঞ্জনা বড়ুয়া। একসময় তিনি ছিলেন একজন সাধারণ গৃহিনী। চার সদস্যের পরিবারে ছিল নিত্য অভাব-অনটন, পরিবারে একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন তার স্বামী, কিন্তু স্বামীর আয়ও ছিল সীমিত এবং অনিয়মিত। সন্তানদের পড়াশোনা, সংসার চালানো সব মিলিয়ে অঞ্জনার জীবনের প্রতিটি দিন ছিলো এক নতুন লড়াই। আগামীকাল কি হবে এই চিন্তায় শেষ হত অঞ্জনার দিন। সব মিলিয়ে জীবনের প্রতিটি দিনই ছিল অঞ্জনার জন্য এক একটি নতুন সংগ্রাম।

অভাবের মাঝেও স্বপ্ন দেখা

ছোট বেলা থেকে পশু পালনে আগ্রহ ছিল অঞ্জনার। এক সময় তাদের বাড়িতে একটি মাত্র দেশি গরু ছিল কিন্তু ছিল না প্রযুক্তিগত জ্ঞান, প্রশিক্ষণের সুযোগ। জানতেন না গরুর জাত উন্নয়নের উপায়। কি করলে গরু থেকে আয় করা সম্ভব। কি ধরনের পুষ্টিকর খাবার দিলে গরুর দুধ বেশি হয়, রোগ প্রতিরোধে ভ্যাকসিন ব্যবস্থাপনা কেমন এসব কিছুই জানতেন না অঞ্জনা বড়ুয়া। কিন্তু এক সময় তিনি ভাবতে লাগলেন যদি তিনি গরু পালন এর উপর প্রশিক্ষণ পেতেন তবে ঘরে থেকেই অর্থ উপার্জন এর মাধ্যমে স্বাচ্ছন্দময় সংসার জীবন গড়ে তুলতে পারতেন। অঞ্জনা বুঝতে পারতেন, সঠিক দিকনির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ পেলে তিনি ঘরে বসেই একটি আয়মুখী উদ্যোগ গড়ে তুলতে পারেন। এই ভাবনাই তার মনে নতুন স্বপ্নের বীজ বপন করে।

প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন যাত্রা:

এই সময়েই তাদের গ্রামে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প” এলডিডিপি’র এর কার্যক্রম শুরু হয় এবং ২০২২ সালে “পূর্ব রাজারকুল ডেইরি প্রডিউসার গ্রুপ” নামে একটি দল গঠন করা হয়। যেখানে অঞ্জনাও পিজির সাধারণ সদস্য পদে অন্তর্ভুক্ত হন এবং প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে তার স্বপ্নের পথচলা শুরু হয়।

পিজি-তে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর অঞ্জনা নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের উপর প্রশিক্ষণ লাভ করেন:

- প্রডিউসার গ্রুপের নিয়ম নীতি ও মূল্যবোধ
- গবাদিপশুর জাত সম্পর্কে পরিচিতি
- ডেইরি উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা

- পশু খাদ্য খাওয়ানো ও দুগ্ধবতী গবাদি পশুর পুষ্টি
- প্রানী পুষ্টি
- ব্যবসা পরিকল্পনা ও বাজার জাতকরণ
- জেডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি
- পারিবারিক পুষ্টি ও জনস্বাস্থ্য
- পরিবেশ বান্ধব ও জলবায়ু সহিষ্ণু দুগ্ধ খামার
- দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি
- অভিযোগ নিষ্পত্তির কৌশল

এই প্রশিক্ষণগুলো অঞ্জনাকে শুধু একজন খামারি নয়, বরং একজন সচেতন উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

প্রশিক্ষণের জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ:

প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত জ্ঞান অঞ্জনা তার খামারে বাস্তবভাবে প্রয়োগ করতে শুরু করেন। তিনি ইউএমএস, টিএমআর, সাইলেজ তৈরি, উন্নত জাতের ঘাস চাষসহ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করেন। খামার নতুনভাবে সাজিয়ে উন্নত জাতের গাভী পালন শুরু করেন এবং নিজস্ব জমিতে ঘাস চাষ করেন।

এলডিডিপি প্রকল্পের আওতায় পূর্ব রাজারকুল ডেইরি পিজিকে একটি ঘাস কাটার মেশিন প্রদান করা হয়। অন্যান্য সদস্যদের মতো অঞ্জনাও নিয়মিত এই মেশিন ব্যবহার করেন, যা তার শ্রম ও সময় দুটোই সাশ্রয় করেছে।

তিনি নিয়মিত টিকাদান ও কৃমিনাশক প্রয়োগ করেন, ফলে খামারে রোগের প্রকোপ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ে উৎপাদন ও আয়ের উপর। প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান অঞ্জনা তার খামারে প্রতিনিয়ত কাজে লাগান। তিনি নিয়মিত গবাদিপশুকে টিকা প্রদান করেন, কৃমিনাশক খাওয়ান; এতে করে তার খামারে রোগের প্রকোপ কমেছে; বৃদ্ধি পেয়েছে উৎপাদন। এখন তিনি প্রতিদিন দুধ বিক্রি করে স্থায়ী আয়ের পাশাপাশি স্থানীয় বাজারে গরু বিক্রির মাধ্যমে মৌসুমি আয়ও করেন। অঞ্জনার খামারে বর্তমানে ৬ টি গাভী, ৩টি বকনা ও ৩টি ষাঁড় রয়েছে এবং তিনি দৈনিক ৬০ লিটার দুধ স্থানীয় বাজারে বিক্রি করেন। তার মাসিক গড় আয় আগের তুলনায় কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তার স্বামী তাকে খামারের কাজে সহায়তা করেন এবং তারা দুজন মিলে প্রতিদিন খামারের পরিচর্যা, ঘাস সংগ্রহ ও দুধ বিক্রির কাজ পরিচালনা করেন। অঞ্জনার বড়ছেলে এখন মাধ্যমিকে ও ছোট ছেলে প্রাইমারি স্কুলে পড়ছে। এখন পরিবারে আর্থিক অনটন নেই, ঘরে হাসি-আনন্দ ফিরে এসেছে।

সূচক	প্রকল্পের পূর্বে	প্রকল্প বাস্তবায়নের পর
গাভীর সংখ্যা	১ টি	৬ টি
বকনার সংখ্যা	০	৩ টি
ষাঁড়ের সংখ্যা	০	৩ টি
দৈনিক গড় দুধ উৎপাদন	০	৬০ লিটার
মাসিক গড় আয়	অনিয়মিত	৮৭,৫০০ টাকা

অঞ্জনা বড়ুয়া তার পরিশ্রম ও দক্ষতার স্বীকৃতি হিসেবে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, রামু, কক্সবাজার কর্তৃক আয়োজিত প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী-২০২৪ এ অংশগ্রহণ করেন এবং গবাদিপশু ক্যাটাগরিতে পুরস্কার অর্জন করেন। এই স্বীকৃতি তার আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে দেয়। অঞ্জনা বড়ুয়া বলেন, “খামার করার জন্য অবশ্যই বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন প্রয়োজন, আর প্রয়োজন সঠিক দিক নির্দেশনা যা আমি পেয়েছি এলডিডিপি প্রকল্পের মাধ্যমে। এখন আমি নিজে সচ্ছল, অন্যদেরকেও উৎসাহ দিচ্ছি এ পেশায় আসতে। এখন খামার থেকে যা আয় হয় তা দিয়ে খুব ভালে ভাবে সংসার কাটছে আমার”।

ব্যবসার সম্প্রসারণ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

অঞ্জনা বড়ুয়া আগামী দিনে তার খামারকে আরও বড় পরিসরে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছেন। তার ভবিষ্যৎ লক্ষ্যসমূহ:

- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নত শেড নির্মাণ
- উন্নত জাতের আরও দুগ্ধবতী গাভী সংযোজন
- দুধের পাশাপাশি দই, ঘি ও অন্যান্য দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন

এই উদ্যোগগুলোর মাধ্যমে তিনি দেশের দুগ্ধ শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে চান। আজ অঞ্জনা বড়ুয়া পূর্ব রাজারকুল ইউনিয়নের একজন সফল নারী উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিত। তার সাফল্য দেখে অনেক পিছিয়ে পড়া নারী গবাদিপশু পালনে আগ্রহী হচ্ছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন সুযোগ, প্রশিক্ষণ ও দৃঢ় মনোবল থাকলে একজন সাধারণ নারীও নিজের ভাগ্য বদলাতে পারেন।

মিল্ক চিলিং পয়েন্ট ফিরোজ মিয়ার সাফল্যের কেন্দ্রবিন্দু

কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলা ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ের চর এলাকার একটি গ্রাম ২২ পাড়া। চরের মানুষ এমনিতেই পরিশ্রমী। টিকে থাকার জন্য তাদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। সেই গ্রামটির অবস্থান প্রত্যন্ত এলাকায়, যেখানে কৃষি ও পশুপালনই মানুষের প্রধান জীবিকার উৎস। এই এলাকার অধিকাংশ পরিবার ছোট আকারের খামারের ওপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে গাভী পালন এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়মূলক কার্যক্রম হলেও দীর্ঘদিন ধরে দুধ বাজারজাতকরণ ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এলাকার সঙ্গে নিকটবর্তী শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা দুর্বল। কাঁচা রাস্তা, পর্যাপ্ত যানবাহনের অভাব এবং দূরত্বের কারণে ভোরে দোহন করা দুধ বাজারে পৌঁছাতে অনেক সময় লেগে যেত। গরম আবহাওয়া ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় দুধ দ্রুত নষ্ট হয়ে যেত। সেই গ্রামের মোঃ ফিরোজ মিয়া একজন খামারি, যিনি দীর্ঘদিন ধরে গাভী পালন করে আসছেন। কিন্তু তার এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ায় দুধ বাজারজাতকরণে ছিল নানা সমস্যা। হাটে পৌঁছাতে না পারলে সেই দুধ স্থানীয়ভাবে কম দামে বিক্রি করতে হতো বা ফেলে দিতে হতো। সেই সঙ্গে দুধ সংরক্ষণের কোনো আধুনিক ব্যবস্থা ছিল না। এই পরিস্থিতিতে ফিরোজ মিয়া ধীরে ধীরে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েন। দুধ উৎপাদনে অগ্রহ কমে যেতে থাকে।

প্রকল্প সংযোগ:

মোঃ ফিরোজ মিয়া ২২ পাড়ার একজন পরিচিত খামারি। দীর্ঘদিন ধরে গাভী পালন করলেও দুধ নষ্ট হওয়া ও কম দামে বিক্রির সমস্যায় তিনিও নিয়মিত ক্ষতির সম্মুখীন হতেন ফলে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প এলডিডিপি'র মাধ্যমে ফিরোজ মিয়া একটি মিল্ক চিলিং পয়েন্ট স্থাপনের সুযোগ পান। তিনি জানতে পারেন কীভাবে দুধ দ্রুত সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করলে সেটার গুণগত মান বজায় রাখা যায়। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ চিলিং মেশিন বসিয়ে দেন তার এলাকা ২২ পাড়ায়। এর মাধ্যমে স্থানীয় খামারিরা খুব সহজেই দুধ সংরক্ষণ করতে পারেন। এছাড়াও, তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়:

- দুধের বিশুদ্ধতা যাচাই।
- দুধের মান নিয়ন্ত্রণ।
- দুধ সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে।

মিল্ক চিলিং পয়েন্ট একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ:

মিল্ক চিলিং পয়েন্ট, যা এলাকার দুগ্ধ খাতের জন্য একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ হিসেবে কাজ করে। এই চিলিং পয়েন্টের মূল উদ্দেশ্য ছিল দুধ দোহনের পর দ্রুত সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা, যাতে দুধের গুণগত মান বজায় থাকে এবং নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি কমে।

যেখানে নির্ধারিত সময়ে খামারিরা দুধ এনে সংরক্ষণ করতে পারেন। এই মিল্ক চিলিং পয়েন্ট শুধু একটি যন্ত্র নয়, বরং এটি হয়ে ওঠে এলাকার খামারিদের জন্য একটি দুধ সংগ্রহ কেন্দ্র। এখানে দুধ জমা হওয়ার পর তা নির্দিষ্ট সময় পর ক্রেতার কাছে পাঠানো হয়। ফলে খামারিরা ন্যায্যমূল্য পাওয়ার সুযোগ পান।

ফিরোজ মিয়ার পরিবর্তন:

চিলিং পয়েন্ট চালু হওয়ার পর মোঃ ফিরোজ মিয়ার দুধ বিক্রিতে নতুন গতি এসেছে। এখন তিনি দুধ সংগ্রহ করে স্থানীয়ভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর বড় দুধ মিল বা দোকানে পাঠাতে পারেন। এতে করে দুধ নষ্ট হয় না, দামও আগের চেয়ে অনেক ভালো পান। শুধু তিনিই নন, আশেপাশের আরও ২০-২৫ জন খামারি এখন এই সুবিধার আওতায় এসেছেন। এলাকার খামারিরা এই সুবিধা পাওয়ায় একটি ক্ষুদ্র দুধ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে, যা পুরো অঞ্চলের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। তিনি মাসে এখন প্রায় ৩০-৪০% বেশি আয় করছেন, যা দিয়ে পরিবারে সচ্ছলতা এসেছে। আগের লোকসানের জায়গায় এখন তিনি সঞ্চয়ের কথা ভাবেন। ফিরোজ মিয়া বলেন, “আগে দুধ বেচা নিয়ে চিন্তায় থাকতাম। অনেক সময় হাটে পৌঁছানোর আগেই দুধ টক হইয়া যাইত। এখন চিলিং মেশিন থাকায় আমরা সহজেই দুধ রাখি, ভালো দামে বিক্রি করি। প্রকল্পটা আমাদের জীবনটাই বদলাই দিছে।”

চিলিং পয়েন্ট ও তার ফলাফল:

মিল্ক চিলিং পয়েন্ট চালু হওয়ার পর মোঃ ফিরোজ মিয়ার জীবনে আসে দৃশ্যমান পরিবর্তন। এখন তিনি দুধ দোহনের পর তা দ্রুত চিলিং পয়েন্টে সংরক্ষণ করতে পারেন। দুধ নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রাখার ফলে তার মান অক্ষুণ্ণ থাকে এবং নির্ধারিত সময়ে ভালো দামে বিক্রি করা সম্ভব হয়। শুধু নিজের দুধ সংরক্ষণেই সীমাবদ্ধ থাকেননি মোঃ ফিরোজ মিয়া। তিনি আশপাশের খামারিদেরও এই চিলিং পয়েন্ট ব্যবহারে উৎসাহিত করেন। বর্তমানে তার সঙ্গে আরও প্রায় ২০-২৫ জন খামারি নিয়মিত এই সুবিধা গ্রহণ করছেন। এর ফলে এলাকায় একটি ক্ষুদ্র কিন্তু কার্যকর দুধ উৎপাদন ও সংগ্রহ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। মিল্ক চিলিং পয়েন্টের কারণে মোঃ

ফিরোজ মিয়ার মাসিক আয় প্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে যেখানে লোকসান ছিল নিত্যসঙ্গী, এখন সেখানে এসেছে স্থিতিশীল আয় ও সঞ্চয়ের সুযোগ। পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে, সন্তানদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যয়ে তিনি এখন আরও নিশ্চিত।

ফিরোজ মিয়ার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

এই উদ্যোগের প্রভাব শুধু একজন খামারিতে সীমাবদ্ধ নয়। পুরো এলাকায় দুধ উৎপাদনে আগ্রহ বেড়েছে, ফিরোজ মিয়া তার খামারে গাভীর সংখ্যা বাড়ানোর কথা ভাবছেন। আরও বড় পরিসরে একটি আধুনিক খামার স্থাপন করতে চান। তার খামারে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে চান। ২২ পাড়ার মিল্ক চিলিং পয়েন্ট প্রমাণ করেছে সঠিক প্রযুক্তি, সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ এবং বাজার সংযোগ থাকলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে বড় পরিবর্তন আনা সম্ভব। মোঃ ফিরোজ মিয়ার সাফল্যের গল্প শুধু একজন খামারির অর্জন নয়; এটি একটি এলাকার সম্ভাবনার প্রতিচ্ছবি। এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে আরও অনেক খামারির জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।

স্মল স্কেল ফিড মিলস খামারি মোঃ আব্দুর রাজ্জাকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি

বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলা। এই উপজেলার একটি ইউনিয়ন কামারপুকুর। কথিত আছে একটি বড় পুকুরকে কেন্দ্র করে অনেক কামারের কারখানা গড়ে উঠেছিল সেই থেকেই এই এলাকার নাম কামারপুকুর। কামারপুকুর এলাকার বাসিন্দা মোঃ আব্দুর রাজ্জাক একজন ছোট আকারের খামারি। প্রাথমিক অবস্থায় তিনি মাত্র ৫টি গাভী দিয়ে তার খামারের যাত্রা শুরু করেন। আব্দুর রাজ্জাক তার খামারের গাভীর জন্য বাজারের প্রচলিত পশুখাদ্য বেশী দাম দিয়ে ক্রয় করে খাওয়ান। বাজারে প্রচলিত পশু খাদ্যের মন্দ দিক হলো: খাদ্যে পুষ্টির অভাব, উচ্চ মূল্য, ভেজাল মিশ্রণ যা পশুর স্বাস্থ্য ও উৎপাদনশীলতা কমিয়ে দেয়। ফলে খামারির লোকসান হয় এবং খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে পশুর স্বাস্থ্য অবনতি হতে থাকে। উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। পশুর স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। আবার পশু খাদ্যের অধিক মূল্যের কারণে ছোট ছোট খামারিদের জন্য বড় সমস্যা দেখা দেয়। আব্দুর রাজ্জাকের খামারের খরচ বেশী হতে থাকে। দিন দিন তার খামারে লোকসানের পাল্লা ভারী হতে থাকে। এসব চিন্তা ভাবনা থেকেই তিনি মিক্স রেশন (দানাদার খাদ্য) তৈরি করা শুরু করেন। পাশাপাশি সাইলেজও তৈরি করেন। এভাবে তিনি খামারের সাথে স্বল্প পরিসরে পশুখাদ্য বিক্রেতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে থাকেন। তিনি নিজে পশুখাদ্য তৈরি করেন নিজের খামারের জন্য আবার লাভের জন্য তিনি পশুখাদ্য বিক্রি করেন। কিন্তু এখানেও সমস্যা বিস্তার। খাদ্য তৈরি করতে দিনের অনেকটা সময় ব্যয় করতে হয় এবং নিজে একা করা কষ্টকর হয় আবার শ্রমিক রাখাও ব্যয়বহুল।

এলডিডিপি সংযোগ:

আব্দুর রাজ্জাকের চেষ্টা ও আগ্রহ দেখার পর উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার ও প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ অফিসার এর সহযোগিতায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে তিনি ১০ লাখ টাকা অনুদান প্রাপ্ত হন। এই টাকা দিয়ে তিনি স্বল্প পরিসরে খাদ্য তৈরির জন্য ক্রাশার, ফেরিং, মিক্সার এবং পিলেট মেশিন ক্রয় করেন। এই স্মল স্কেলের ফিড মিল স্থাপনের ফলে এখন তার উৎপাদন খরচ অনেক কম হয়। নিজের খামারে এটি একটি মানসম্মত ও পুষ্টিকর সুস্বাদু খাদ্য নিশ্চিত করার একটি সাশ্রয়ী ও কার্যকর সমাধান। স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে খামারের সামগ্রিক মুনাফা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এখন প্রকল্পের সহযোগিতায় তিনি ৩০ মিনিটের মধ্যে পূর্বের চেয়ে অধিক পরিমাণে খাদ্য প্রস্তুত করতে পারেন। এতে তার ব্যয় ও কষ্ট কম হয়। প্রকল্পের সহযোগিতা লাভের পর তিনি তার প্রতিষ্ঠান আশা এগ্রো ফিড এ লাভের মুখ

দেখতে পান। তার অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়। তিনি পূর্বে মিল থেকে মাসে ৫০,০০০-৬০,০০০ টাকা আয় করতেন বর্তমানে তার মিল থেকে মাসিক আয় প্রায় ২,০০,০০০ টাকা এছাড়াও তিনি খামারিদের মাঝে ভেজালমুক্ত ফিড বাজার অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রি করছেন। এতে করে খামারিরা উপকৃত হচ্ছেন পাশাপাশি গবাদিপশু ভেজালমুক্ত খাদ্য পাচ্ছে। খাদ্য তৈরিতে সময় কম লাগায় তিনি খামারেও সময় দিতে পারেন এতে তার গাভীর সংখ্যা ০৫ থেকে ০৯ এ উন্নীত হয় এবং খামারের আয় ২০,০০০-২৫,০০০ টাকা থেকে ৫০,০০০-৬০,০০০ এ উন্নীত হয়।

নিচে তার খামারের অগ্রগতি দেখানো হল:

সূচক	প্রকল্পের পূর্বে	প্রকল্প বাস্তবায়নের পর
গড় ফিড উৎপাদন (টন/দিন)	০.৬	১.৫
মিল থেকে মাসিক গড় আয় (টাকা)	৫০,০০০-৬০,০০০	২০০,০০০
গাভীর সংখ্যা	৫	৯
খামার থেকে মাসিক গড় আয় (টাকা)	২০,০০০-২৫,০০০	৫০,০০০-৬০,০০০

আব্দুর রাজ্জাক বলেন, “স্মল স্কেল ফিড মিল দিয়ে গরুর খামার করলে চাহিদা অনুযায়ী সুস্বাদু ও পুষ্টিগুণবর্ধিত খাদ্য তৈরি করা যায়, যা খরচ কমায় ও দুধ বা মাংস উৎপাদন বাড়ায়; ছোট বা মাঝারি খামারের জন্য উপযুক্ত, কম জায়গা ও কম শ্রমিকের প্রয়োজন হয়, এবং এতে গরুর স্বাস্থ্য রক্ষা ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করে”।

বিপণন ব্যবস্থা:

আব্দুর রাজ্জাক তার নিজস্ব খামারে স্মল স্কেল ফিড মিল স্থাপন করে তার খামারের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করার পাশাপাশি খাদ্যের গুণমান বজায় রাখেন যা ব্যবসার দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব ও লাভের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তার ক্রেতাদের জন্য চাহিদা অনুযায়ী প্রাণীর বয়স ও প্রয়োজন অনুযায়ী খাবার তৈরি করে থাকেন। স্থানীয় ছোট ছোট খামারিদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের কাছে পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করে থাকেন। ফিডের গুণগত মান, প্রোটিনের হার পুষ্টিমান বজায় রেখে বাজারে সুনামের সাথে ব্যবসা পরিচালনা করে থাকেন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

আব্দুর রাজ্জাক তার এই ছোট আকারের ফিড মিলকে আরো বড় পরিসরে ফিড মিল করার স্বপ্ন দেখেন। তিনি ভেজালমুক্ত খাদ্য সরবরাহ করতে চান। যাতে অন্য খামারিরা ভেজাল খাদ্য গ্রহণ করে প্রাণিসম্পদকে হুমকির মধ্যে না ফেলেন। তার কারখানায় আরো অনেক লোকের কর্মসংস্থান তৈরি করে সমাজে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে যেতে চান।

অল ফ্লেড ফিড মিলস খামারি মোতাকিম চৌধুরীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি

হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলার আন্দিউড়া গ্রামের একজন ডেইরি খামারি মোঃ মোতাকিম চৌধুরী। এলাকার অধিকাংশ মানুষের জীবিকা কৃষি ও প্রাণিসম্পদের ওপর নির্ভরশীল। মাধবপুর উপজেলায় ছোট ও মাঝারি আকারের গবাদিপশুর খামার প্রচুর থাকলেও আধুনিক ব্যবস্থাপনা, মানসম্মত খাদ্য সরবরাহ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তার অভাবে খামারিরা কাজক্ষিত উৎপাদন ও লাভ অর্জন করতে পারতেন না। দানাদার খাদ্যের জন্য খামারিদের বাজারের ওপর নির্ভর করতে হতো, যা সময়মত পাওয়া যেত না এবং অনেক ক্ষেত্রেই খাদ্যের গুণগত মান ছিল নিম্নমানের। মোতাকিমের খামার পরিচালনা ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল। অধিক খরচের কারণে উৎপাদন কম হওয়ায় তিনি ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ছিলেন। খরচ বেশি ছিল কিন্তু উৎপাদন কম ছিল। যার জন্য প্রাণিসম্পদ ঠিকিয়ে রাখা কষ্টসাধ্য ছিল। দুধ উৎপাদন আশানুরূপ হচ্ছিল না। দুধ উৎপাদন ছিল প্রায় ৪৫০-৫০০ লিটার। অধিক খরচ ও কম উৎপাদনের কারণে খামার পরিচালনা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠছিল।

এলডিডিপি সংযোগ:

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় লাইভস্টক এন্ড ডেইরি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের ম্যাচিং গ্রান্টস এর ফিড মিল স্থাপনের মাধ্যমে খামার ব্যবস্থাপনায় এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধান এবং প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তার সার্বিক সহযোগিতায় ম্যাচিং গ্রান্টস কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করা হয়। এই সহায়তার ফলে নিজস্বভাবে দানাদার খাদ্য প্রস্তুত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য মিশ্রিত করায় গুণগত মান নিশ্চিত করা সম্ভব হয় এবং সময়মত প্রাণীকে খাদ্য সরবরাহ করা সহজতর হয়। ফিড মিল খামার পর্যায়ে নিজস্ব ব্যবহারের জন্য এবং প্রাণী খাদ্য ব্যবসার জন্য পরিচালিত হয়ে থাকে। বহুমুখী ব্যবহার এবং সহজ অপারেশন এর মাধ্যমে ফিড মিলের ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক।

উৎপাদনে পরিবর্তন:

খামারে ফিড মিল স্থাপিত হওয়ার পর খামারের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়।

- দানাদার খাদ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়
- খাদ্য সরবরাহে সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত হয়
- উৎপাদন খরচ হ্রাস পায়
- পশুর স্বাস্থ্য ও উৎপাদনক্ষমতা উন্নত হয়

এর সরাসরি প্রভাব পড়ে দুধ উৎপাদনের ওপর। বর্তমানে দৈনিক দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ৫৫০-৬০০ লিটারে উন্নীত হয়েছে। ফলে খামারের লাভ বৃদ্ধি পেয়েছে

এবং খামার পরিচালনা সহজ হয়েছে।

মোত্তাকিমের সামাজিক অবস্থান

ম্যাচিং গ্রান্টস কার্যক্রমের সুফল শুধু এই খামারেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। পার্শ্ববর্তী এলাকার অনেক ক্ষুদ্র খামারি সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্মত দানাদার খাদ্য ত্রয় করার সুযোগ পাচ্ছেন। এতে তারা নতুন করে খামার পরিচালনায় আগ্রহী হচ্ছেন এবং উৎপাদন বাড়াতে উৎসাহিত হচ্ছেন।

এই উদ্যোগের মাধ্যমে এলাকায় নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে, যা স্থানীয় বেকারত্ব দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বিপণন ব্যবস্থা

মোত্তাকিম চৌধুরি সরাসরি স্থানীয় খামারিদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করে থাকেন। পণ্যের ন্যায্যমূল্য রাখেন। খামারিদের চাহিদা অনুযায়ী ফিড তৈরি করে তাদেরকে সরবরাহ করে থাকেন। এলাকার খামারিদের সাথে পরামর্শ করে ফিডের গুণগত মান ধরে রাখার চেষ্টা করে থাকেন। সর্বোপরি ফিডের মান (পুষ্টিগুণ) বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি খামারিদের বিশ্বাস অর্জন করে। মোত্তাকিম এ ব্যাপারে সজাগ থাকেন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

ভবিষ্যতে আশেপাশের ক্ষুদ্র খামারিদের নিয়ে সমবায় ভিত্তিক গ্রুপ গঠন করে বাণিজ্যিকভাবে দানাদার খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। এর মাধ্যমে আরও বেশি খামারিকে সাশ্রয়ী মূল্যে গুণগত মানসম্পন্ন প্রাণিখাদ্য সরবরাহ করা সম্ভব হবে এবং প্রাণিসম্পদ খাতের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

এলডিডিপি'র ম্যাচিং গ্রান্টস খামার ব্যবস্থাপনায় একটি কার্যকর ও সমন্বয়যোগ্য উদ্যোগ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। গুণগত মান বজায় রেখে সময়মত গবাদিপশুর খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, লাভ অর্জন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। এই সাফল্য ভবিষ্যতে অন্যান্য খামারিদের জন্য একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হবে।

মোত্তাকিম চৌধুরি বলেন, “আগে দানাদার খাবার কিনতে হতো, সময়মত পাওয়া যেতো না, পেলেও গুণগত মান ভাল থাকত না, ফলে খরচ বেড়ে যেত এবং উৎপাদনও কম হতো, তাই লাভও কম হতো। কিন্তু প্রজেক্টের সহায়তায় এখন সময় মত দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে পারতেছি, নিজে মিশ্রিং করে দিচ্ছি, তাই গুণগত মানও ঠিক থাকছে ফলে খরচ কমেছে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে বলে লাভও বৃদ্ধি পেয়েছে। এলডিডিপি এর সহায়তায় এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে ও প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তার সার্বিক সহযোগিতায় উক্ত ম্যাচিং গ্রান্টস পরিচালনা করে সুফল ভোগ করছি”।

মোঃ তৌহিদ ইবনে হুমায়ূন অদম্য পরিশ্রম ও সাফল্যের উদাহরণ

গাইবান্ধার জেলার সাঘাটা উপজেলার জালালাবাদ ইউনিয়নের এক প্রত্যন্ত গ্রাম যোগিপাড়া। অধিকাংশ মানুষ কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। আবার অনেকে কৃষি কাজের পাশাপাশি গবাদিপ্রাণী লালন পালন করে থাকেন। সাঘাটা অঞ্চলটি খরাপ্রবণ এলাকা। সেই গ্রামের সাধারণ এক পরিবারে জন্ম নেওয়া মোঃ তৌহিদ ইবনে হুমায়ূনের জীবন শুরু হয়েছিল সীমিত সামর্থ্য আর অগণিত স্বপ্ন নিয়ে। ছোটবেলা থেকেই তিনি দেখেছেন পরিবারের আর্থিক টানা পোড়েন। সংসারের চাহিদা মেটাতে কখনও পড়াশোনার পাশাপাশি কাজ করেছেন, কখনও আবার স্বপ্নকে সাময়িকভাবে থামিয়ে রাখতে হয়েছে বাস্তবতার চাপে। ২০১৬ সালে মাত্র ৪টি গরু নিয়ে তিনি তার ছোট্ট ডেইরি খামারের যাত্রা শুরু করেন। শুরুটা মোটেই সহজ ছিল না। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, দুধ বিক্রির অনিশ্চয়তা, সঠিক বাজার সংযোগের অভাব এবং আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞানের ঘাটতি। সব মিলিয়ে প্রতিটি দিন ছিল সংগ্রামের। অনেক সময় উৎপাদিত দুধ ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করতে না পেরে লোকসান গুনতে হয়েছে। তবুও তিনি থেমে যাননি। নিজের অদম্য পরিশ্রম, ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দিয়ে এগিয়ে চলেছেন প্রতিটি বাধা অতিক্রম করে। তৌহিদের খামারটি গ্রামীণ পরিবেশে অবস্থিত, যেখানে কৃষি ও পশুপালনই প্রধান জীবিকা। এলাকাটি প্রাকৃতিকভাবে অনুকূল হলেও আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণের অভাব ছিল প্রকট। ফলে অনেক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তিনি কাজিফত সাফল্য অর্জন করতে পারছিলেন না।

তৌহিদের প্রকল্পে অংশগ্রহণ:

এই বাস্তবতায় ২০২০ সালে তৌহিদ যুক্ত হন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প” এলডিডিপি’র যোগিপাড়া ডেইরি প্রডিউসার গ্রুপ এর সঙ্গে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস ও প্রকল্পের সহায়তায় তার খামারে পরিবর্তনের সূচনা হয়। প্রকল্পের আওতায় তৌহিদ যে সহায়তাগুলো পান, তা তার খামারের গতিপথ বদলে দেয়। বিশেষ করে দুটি আধুনিক যন্ত্র তার জন্য আশীর্বাদ হয়ে আসে।

প্রকল্প থেকে সহায়তা:

- আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ: এই বিষয়ের উপর তৌহিদ প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর জানতে পারেন, একটি আধুনিক খামারের কি কি

বৈশিষ্ট্য। খামারের প্রাণীখাদ্য ব্যবস্থাপনা কেমন হওয়া উচিত। কি ধরনের খাবার দিলে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়। কোন সময়ে কোন টিকা প্রদান করতে হয়। কিভাবে কৃষি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। রোগ প্রতিরোধের জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। তৌহিদ এ সম্পর্কে সবকিছু জানতে পারেন প্রকল্পের এই প্রশিক্ষণ থেকে।

- দুধ বিপণনে সহায়তা: প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের সহায়তার মাধ্যমে তৌহিদ জানতে পারেন, কোথায় কিভাবে দুধের সঠিক মূল্য পাওয়া যেতে পারে। দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণ করে কিভাবে বাজারজাত করা যায়। বিপণন ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করতে তৌহিদকে পরামর্শ দেয়া হয়। কিভাবে স্থানীয় বাজারে বিক্রির সময় দুধের মান ও পরিচ্ছন্নতা বজায় থাকে তা তৌহিদ এই প্রকল্প থেকে জানতে পারে।
- মোবাইল মিল্কিং মেশিন: মোবাইল মিল্কিং মেশিন তার খামারের উৎপাদন ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। হাতে দুধ দোহনের পরিবর্তে এই মেশিন ব্যবহারের ফলে খামারির সময় সাশ্রয় হচ্ছে। মেশিনের কারণে দুধ দোহন প্রক্রিয়া স্বাস্থ্যসম্মত হচ্ছে। পাশাপাশি গাভীর স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকছে। যার ফলে খামারে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- মিল্ক ক্রিম সেপারেটর মেশিন: এই মেশিনের মাধ্যমে দুধ থেকে দ্রুত ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ক্রিম আলাদা করা সম্ভব হয়। আগে যেখানে হাতে বা প্রথাগত পদ্ধতিতে সময়সাপেক্ষ ও কম কার্যকর প্রক্রিয়ায় কাজ করতে হতো, এখন সেখানে অল্প সময়েই বেশি পরিমাণে মানসম্মত দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে দুধের পাশাপাশি মাখন, ঘি ও অন্যান্য দুগ্ধজাত পণ্য তৈরি করে অতিরিক্ত আয় নিশ্চিত হয়েছে।

তৌহিদের সাফল্য:

প্রকল্পের সহায়তার মাধ্যমে তৌহিদের খামারে দৃশ্যমান পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে তার খামারে গরুর সংখ্যা ২৭টি, যার মধ্যে ২১টি দুধ উৎপাদনকারী গাভী। ২০২২ সালে তিনি ৫,০০০ লিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন একটি দুধ চিলিং সেন্টার স্থাপন করেন, যা স্থানীয় পর্যায়ে দুধ সংরক্ষণের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। বর্তমানে তিনি প্রাণ ডেইরি এবং ব্যাক-এর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছেন। এখন তার খামারে সরাসরি ৭ জন মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। শুধু নিজের আর্থিক উন্নয়ন নয়, তিনি স্থানীয় অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন।

সূচক	প্রকল্পের পূর্বে	প্রকল্প বাস্তবায়নের পর
গরুর সংখ্যা	৪ টি	২৭ টি
গড় দুধ উৎপাদন (লিটার/গাভী/দিন)	০৩ লিটার	০৯ লিটার
মাসিক গড় আয়	১০,০০০ টাকা	৫০,০০০ টাকা
কর্মসংস্থান	২ জন	৭ জন
দুধ সংরক্ষণ ক্ষমতা	০ লিটার	৫০০০ লিটার

মোঃ তোহিদ ইবনে হুমায়ূন বলেন, “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের সহায়তায় আমি আধুনিক দুধ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের কৌশল শিখেছি। এখন আমার খামারে শুধু দুধ নয়, দুগ্ধজাত পণ্যও তৈরি হয়।”

তোহিদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

তোহিদ তার খামারের আয় দিয়ে খাদ্য উৎপাদন, পশুপালন ও দুধ সংরক্ষণের জন্য নিজস্ব অবকাঠামো গড়ে তুলেছেন। স্থানীয় খামারিদেরও তিনি প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করছেন। ফলে এলাকাজুড়ে ডেইরি শিল্পের প্রসার ঘটছে এবং এটি একটি টেকসই মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে তোহিদ আরও বড় পরিসরে দুগ্ধজাত পণ্য বাজারজাত করার পরিকল্পনা করছেন। তার স্বপ্ন এখন আরও বড়, নিজস্ব ব্র্যান্ডে প্যাকেটজাত দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য বাজারে আনা এবং একটি পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত ডেইরি শিল্প গড়ে তোলা।

সম্প্রসারণের সম্ভাবনা:

তোহিদ তার খামারের আয় দিয়ে খাদ্য উৎপাদন, পশুপালন ও দুধ সংরক্ষণের জন্য নিজস্ব অবকাঠামো গড়ে তুলেছেন। ৫,০০০ লিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন চিলিং সেন্টার স্থানীয় খামারিদের জন্যও সুযোগ তৈরি করেছে, ফলে তারা ন্যায্যমূল্যে দুধ বিক্রি করতে পারছেন।

তিনি নিয়মিতভাবে স্থানীয় খামারিদের প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দেন। ফলে এলাকাজুড়ে ডেইরি শিল্পের প্রসার ঘটছে এবং তার খামারটি একটি টেকসই ও অনুকরণযোগ্য মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

একটি মিল্ক ক্রিম সেপারেটর এবং স্বাবলম্বী কাজী কুমকুম আখতারের গল্প

চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলার একটি গ্রাম বটতলী। এই গ্রামের বাসিন্দা কাজী কুমকুম একজন দরিদ্র নারী খামারি। একদিকে অভাবের সংসার আর একদিকে স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন। বটতলী গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে শঙ্খ নদী। প্রবহমান এই নদীর স্রোতের সাথে কুমকুম তার স্বপ্ন ভাসিয়ে দেন নাই, সুদিনের আশায় ২০১৭ সালে একটি ফ্রিজিয়ান গরু দিয়ে শুরু করেন তার খামারি জীবন। দুধ বিক্রি করে গরুর খাবার খরচের পর যে টাকা থাকতো তা দিয়ে সংসার চালানো কঠিন হয়ে যেত। গাভী থেকে উৎপাদন পেতে হলে গাভীকে যথাযথ পরিচর্যা করতে হয়, গাভীর সময়মত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়, গাভীকে সুস্বাদু খাদ্য দিতে হয়। কুমকুম দুধ বিক্রি করে যে টাকা আয় করতেন তা যৎসামান্য। বিশেষ করে করোনার সময় দুধ বিক্রি একেবারে কমে যায়। এই অতিরিক্ত দুধ দিয়ে কি করবেন কুমকুম আখতার তা নিয়ে চিন্তায় পড়ে যান তিনি। তিনি দুধ থেকে ঘি বানানো শুরু করেন। হাতে দুধ থেকে দই, ঘি বানানো তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। তাছাড়া গরুর পরিচর্যা বিষয়ে তেমন ধারণা না থাকায় নানান রোগ বালাইয়ের কারণে আয়ের চেয়ে খরচ হতো বেশি। হঠাৎ একদিন তার গরু অসুস্থ হলে উপজেলার প্রাণিসম্পদ অফিসারকে নিয়ে আসেন চিকিৎসার জন্য। এরপর উপজেলার প্রাণিসম্পদ অফিসারের পরামর্শে তিনি লাইভস্টক এন্ড ডেইরি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এলডিডিপি) এর বটতলী ডেইরি প্রডিউসার গ্রুপে (পিজি) যোগ দেন এবং সেখান থেকেই বদলে যায় তার জীবনের গল্প।

কুমকুম আখতার ২০২১ সালে এলডিডিপি'র পিজি সদস্য হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, পরামর্শ ও সহায়তা পেয়েছেন। প্রকল্পের পিজি সদস্য হিসেবে তিনি নিয়মিত প্রশিক্ষণ পান। প্রশিক্ষণ পেয়ে তিনি আধুনিক পদ্ধতিতে খামার করা শুরু করেন। পাশাপাশি তিনি প্রকল্প থেকে একটি মিল্ক ক্রিম সেপারেটর মেশিন প্রণোদনা পান। এরপর থেকেই বদলে যেতে থাকে তার জীবনের গল্প।

এই মিল্ক ক্রিম সেপারেটর মেশিন হল এমন একটি যন্ত্র যার সাহায্যে দুধ থেকে ক্রিম আলাদা করা যায়, যা দ্রুত, সহজে ও দক্ষতার সাথে ক্রিম ও স্কিমড মিল্ক আলাদা করতে পারে। এটি দুধকে দ্রুত প্রক্রিয়াজাত করে এবং ক্রিম আলাদা করে। ঘি, মাখন, দই এবং অন্যান্য দুগ্ধজাত পণ্য তৈরিতে সহায়তা করে। সর্বোপরি ব্যবসার উৎপাদনশীলতা বাড়ায়। ২০২১ সালে বটতলী ডেইরি পিজিতে

প্রকল্প থেকে একটি মিল্ক ক্রিম সেপারেটর মেশিন প্রণোদনা হিসেবে পাওয়ার পর অন্যান্য পিজি খামারিদের মত কুমকুম আখতারও মিল্ক ক্রিম সেপারেটর মেশিন ব্যবহার শুরু করেন, এতে তার ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায়। তিনি দুধ থেকে ঘি, দই, মিষ্টি বানানো শুরু করেন এবং এইসব দুগ্ধজাত প্রোডাক্ট একটি দোকান দিয়ে তার

স্বামীর সাহায্যে বিক্রি করেন তিনি। এখন তার দেখাদেখি এলাকার অন্যান্য পিজি খামারিরাও দুধজাত প্রোডাক্ট বানানো শুরু করেন। কুমকুম আখতার বর্তমানে ৮টি গাভীর মালিক। দৈনিক ৬০-৮০ লিটার দুধ পান। নিজের বানানো দুধজাত বিভিন্ন পণ্য বিক্রি করে দৈনিক প্রায় ৩-৫ হাজার টাকা লাভ করেন। বর্তমানে স্বামী সংসার নিয়ে খুব সুখে আছেন কুমকুম আখতার। লভ্যাংশ দিয়ে তিনি একটি পাকা বাড়িও করেছেন। তার এই সাফল্যের পিছনে এলডিডিপি'র অবদান অনস্বীকার্য। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার এবং সঠিক নিয়মে গরু পালনের ফলে তার দুধের উৎপাদন বেড়ে গড়ে গাভী প্রতি ৪ লিটার থেকে ১০ লিটার হয়েছে। দুধ ও দুধজাত পণ্য বিক্রি করে মাসিক আয় ১৫,০০০/- থেকে বেড়ে বর্তমানে প্রায় ৫০০০০/- টাকা। তিনি ১০জন নারী উদ্যোক্তা তৈরি করেছেন।

সূচক	প্রকল্পের পূর্বে	প্রকল্প বাস্তবায়নের পর
গাভীর সংখ্যা	১	৮
মাসিক আয়	১৫,০০০ টাকা	৫০,০০০ টাকা

কুমকুম আখতার বলেন, “এলডিডিপি প্রকল্পে আসার আগে আমার খামার করে তেমন কোনও লাভ হতোনা। দুধ বিক্রি করে খরচ উঠত না। কিন্তু মিল্ক ক্রিম সেপারেটর মেশিন পাওয়ায় পর দুধ থেকে ঘি তৈরি শুরু করে আমার জীবন বদলে যায়। বর্তমানে আমি দুধ থেকে ঘি, মিষ্টি, ছানা, দই, মালাই, চমচম ইত্যাদি বানিয়ে বিক্রি করে অনেক লাভবান হয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ, শ্বশুর, শাশুড়ি স্বামী এবং এক মেয়ে সন্তান নিয়ে অনেক সুখে আছি। আমি এই প্রকল্পের কাছে ঋণী”।

বিপণন ব্যবস্থা:

কুমকুম আখতার তার খামারের দুধজাত পণ্যকে খাঁটি ও ঘরোয়া পদ্ধতিতে তৈরি করেন বলে ভোক্তাদের মাঝে প্রচার করে থাকেন। কোনো ক্ষতিকর উপাদান ছাড়া এই পণ্য তৈরি হয় বলে তার কাস্টমার নিয়মিত পণ্য গ্রহণ করে থাকেন। প্রতিযোগিতামূলক মূল্য রাখেন বলে ভোক্তাদের মাঝে পণ্য ক্রয়ের আগ্রহ তৈরি হয়। তার মূল টার্গেট, স্বাস্থ্য সচেতন পরিবার, স্থানীয় ডেইরি দোকানদার। পণ্যকে আকর্ষণীয় করার জন্য মোড়কজাত করে থাকেন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

কুমকুম আখতার ভবিষ্যৎ ভাবনা অনেক। তার খামারে গরুর সংখ্যা বাড়িয়ে ১০০ করতে চান। খামার থেকে দৈনিক ১০০০ লিটার লিটার দুধ উৎপন্ন হবে এই স্বপ্ন নিয়ে একটি আধুনিক খামার নির্মাণের কাজে হাত দিয়েছেন। তিনি ৫০ জন নারী উদ্যোক্তাকে এই প্রকল্পে সংযুক্ত করতে চান। কুমকুম আখতার বলেন, আমাদের লোগান হল “দুধ নয় দুধজাত পণ্য বিক্রি করি, সফলতার জীবন গড়ি”। দুধের চেয়ে দুধজাত পণ্য বিক্রি করলে বেশি লাভবান হওয়া যায় এই ধারণাটি প্রান্তিক খামারিদের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে। কুমকুম আখতারের দেখে অনেকেই এখন দুধজাত পণ্য উৎপাদনে আগ্রহী হচ্ছে।

শিক্ষক ও সফল খামারি আতা উল্লাহ

দুটি পাতা একটি কুঁড়ির দেশ শ্রীমঙ্গল। চা শিল্পের জন্য শ্রীমঙ্গলের সুনাম ও পরিচিতি বিশ্বব্যাপী। আর এই মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার কালাপুর ইউনিয়নের বরুনা গ্রামের মাদ্রাসা শিক্ষক মোঃ আতাউল্লাহ একজন খামারি। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি গাভী পালন করতেন যাতে নিজের পরিবারের পুষ্টি চাহিদা পূরণ হয়। একসময় আতাউল্লাহ মনে করলেন, যদি দুধ বিক্রি করে কিছু আয় করা যায় তাহলে মন্দ হয়না। তখন আতাউল্লাহ প্রাণিসম্পদ বলতে ০১ টি ফ্রিজিয়ান ক্রস গাভী ও ০২ টি দেশী গাভী নিয়ে একটি ছোট আকারের খামারের মাধ্যমে ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু আতাউল্লাহর আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিলনা। তিনি জানতেন না কিভাবে পশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়, পশুর খাদ্য ব্যবস্থাপনা কিরকম হওয়া উচিত। তার ফ্রিজিয়ান গাভী নিয়মিত হিটে আসতো না এবং দেশী গাভীগুলো ছিল কঙ্কালসার। তাছাড়া গাভীর আবাসস্থল স্বাস্থ্যসম্মত না থাকায় গাভী বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতো, পাশাপাশি দুধ উৎপাদন কম হতো এবং প্রায়শই খামার থেকে লোকসান গুনতে হতো। দুধের উৎপাদন ছিল মাত্র ৬.৫ লিটার। একদিন নিজের গ্রামের একজন ছেলের কাছে সন্ধান পান প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প এলডিডিপি খামার উন্নয়নে কাজ করে। এই প্রকল্প থেকে ছোট ছোট খামারিদের অনেক ধরনের প্রশিক্ষণ দেয় আর অনেক কিছু দিয়ে সহায়তা করে। তখন আতাউল্লাহ এলডিডিপি কর্তৃক গঠিত বরুনা ডেইরি পিজি-তে যোগদান করেন।

এলডিডিপি'র সহায়তায় ১৫ টি এলএফএসএস প্রশিক্ষণ, উত্তম চর্চার প্রশিক্ষণ, ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রশিক্ষণ লাভ করেন। এছাড়া, সে এক্সপোজার ভিজিট, ভ্যাক্সিনেশন, ডি-ওয়ার্মিং, মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক সেবা গ্রহণ ও এলইও/এলএফএ/এলএসপিদের নিয়মিত খামার পরিদর্শন ও সেবা গ্রহণের মাধ্যমে তার খামারটি আস্তে আস্তে আলোর মুখ দেখতে থাকে। এলডিডিপি থেকে তাকে একটি চপার মেশিন দেয় হয় তা দিয়ে তার খামারের গাভীর জন্য খাদ্য ব্যবস্থাপনা সহজ হয়েছে। প্রকল্প থেকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন উপকরণ পাওয়ার পর এখন তার লোকসানি খামার লাভের খামারে পরিণত হয়েছে। পিজি'র সদস্য হিসেবে ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি সে অনুযায়ী খামার পরিচালনার ফলে তার খামারের দুধের গড় উৎপাদন ৬.৫ লিটার থেকে ১২ লিটার

হয়েছে। বর্তমানে তার ৫টি গাভী এবং ৪টি বাছুর রয়েছে। প্রতিদিন ৬০ লিটার দুধ উৎপাদন হয়ে থাকে। এই দুধ স্থানীয় এলাকায় বিক্রি করে ফলে নিজ গ্রামের লোকের দুধের চাহিদা পূরণ হয়ে থাকে।

আতাউল্লাহ বলেন “আগে নিজের মত করিয়া গরু পালতাম। গরুর ঘরো, পাও গোবর ভরিয়া থাকতো এবং এর লাগি গোয়াল ঘরো মশা সবসময় বেশি থাকতো এবং গরুরে কামরাইতো। এর লাগি হকল সময়ই গরুর অসুখ লাগি থাকতো। গরুরে জিটা খুশি ইটাওই খাওয়াইতাম। এর লাগি দুধও কম হইতো। দেশী ২ টা গরুর অবস্থা আরও খারাপ আছিল।” তিনি বলেন “এলডিডিপি’র থাকি বিভিন্ন ট্রেনিং পাইয়া আমি আমার খামারের অবস্থা পাল্টাইলাইছি। ওখন আমার খামারো আমিও গুমাইতে পারমু। অত পরিকার রাখি আমার খামারেরে।” তিনি আরও বলেন, “ইতার লাগি আমার গরুর ওখন অসুখও কম হয় এবং দুধও বেশি দেয়”।

গ্রামের কোন বিবাহ বা অন্য কোনও অনুষ্ঠানে দই কিংবা মিষ্টির প্রয়োজন হলে তখন আতাউল্লাহ দুধ বিক্রির পাশাপাশি দই ও মিষ্টি সরবরাহ করে থাকেন। দুধ থেকে দই মিষ্টি তৈরি করে গত বছর ৫০,০০০/- টাকা আয় করেছিলেন।

সূচক	প্রকল্পের পূর্বে	প্রকল্প বাস্তবায়নের পর
গাভীর সংখ্যা	৩	গাভী=৫, বাছুর=৪
দৈনিক দুধ উৎপাদন	৬.৫ লিটার	৬০ লিটার
দুগ্ধজাত পণ্য থেকে আয়	ছিলোনা	৫০,০০০ টাকা
রান্নার খরচ	২০০০ টাকা	(বায়োগ্যাস থেকে)
সবজি চাষে সারের ব্যবহার	বাজার থেকে ক্রয়	বায়োগ্যাস থেকে সংগ্রহ

আতা উল্লাহ আগে বাণিজ্যিক ভাবে খামার করতো না। কিন্তু এলডিডিপি’র পিজি’র সদস্য হয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ নিয়ে বাণিজ্যিকভাবে খামার পরিচালনায় আগ্রহী হয়ে এখন তিনি এই খামার নিয়ে অনেক আশাবাদী। গরুর গোবর দিয়ে সে একটি একটি বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরি করেছেন। বাসার রান্নার কাজে এই বায়োগ্যাস ব্যবহার করে থাকেন।

আতাউল্লাহ আরও বলেন “আমার পরিবার আগে লাকড়ির চুলাত রানতো, তার খুব কষ্ট হইতো, লগে লাকড়ির খরচও বেশি হইতো। এলডিডিপি’র থাকি শিক্ষা লইয়া ওখন একটা বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট করিলাইছি। ইটার লাগি আমার গোবরও কামো লাগছে এবং রান্না করার খরচ, কষ্ট দুইটাই কমি গেছে। একস্ট্রা লাভ হইছে, বায়োগ্যাস থাকি যে সার পাই, ইটা দিয়া ক্যামিকেলমুক্ত সবজি চাষ

করতাম পারি। ইটায় আমার সারের খরচও কমাই দিছে, সাথে সাথে গোবরের গন্ধে এলাকাত যে দুর্গন্ধ হইতো, ইটাও বন্ধ হইছে”।

আতা উল্লাহ-এর সাফল্য দেখে বরুণা গ্রামে অনেক পরিবার খামার ব্যবসায় আগ্রহী হচ্ছেন। গ্রামের অন্য অনেক মানুষ যারা গাভী পালনের সাথে যুক্ত, তাদের উক্ত পিজির সদস্য বানান। তিনি তাদের কে বলেন, প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়, কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উন্নত জাতের বাছুর উৎপাদন করা যায়। আতাউল্লাহ তার খামারের দুগ্ধবতী গাভীর স্বাস্থ্য পরিচর্যা, নিয়মিত টিকা প্রদান ও কৃমিনাশক প্রয়োগ করে খামারটিকে একটি আধুনিক খামারে পরিণত করেছেন। খামারের উত্তম চর্চা, খামারের হাউজিং ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করেছেন। মূল শিক্ষা যেটা তিনি পেয়েছেন সেটা হল, গাভী-কে যদি সন্তান স্নেহে পালন করা হয়, তাহলে গাভীও ভালো ফল দিয়ে থাকে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

আতাউল্লাহর এখন একটাই লক্ষ্য, আগামী ১ বছরের মধ্যে তার খামার থেকে দুধ ১০০ লিটার উৎপাদন করা এবং সাথে সাথে দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

বিপণন ব্যবস্থা:

নিরাপদ ও দ্রুত উপায়ে উৎপাদিত দুধ ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেয়া আতা উল্লাহর প্রধান কাজ। দুধের গুণগত মান বজায় রাখতে সে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। দুধ দিয়ে দুগ্ধজাত পণ্য তৈরি করে তা ভোক্তার কাছে বিক্রি করা। আতাউল্লাহ মনে করেন, সঠিক মূল্য, সঠিক সময়, গুণগত মান বজায়, বাজার চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ ঠিক থাকলে তার খামারটি টিকে থাকবে।

প্রযুক্তির ছোঁয়ায় দুধ উৎপাদনে আবছার উদ্দীন মোঃ রাসেলের সাফল্য

আবছার উদ্দীন মোঃ রাসেল পটিয়া উপজেলার হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নের দক্ষিণ হুলাইন গ্রামের একজন উদ্যোগী খামারি। এলাকাটি কৃষি ও প্রাণিসম্পদের জন্য উপযোগী হলেও আগে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ছিল সীমিত। বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ খাতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে ডেইরি খাতে যান্ত্রিক দোহন পদ্ধতি (মিল্কিং মেশিন) ব্যবহার দুধ উৎপাদন, গুণগত মান সংরক্ষণ এবং খামারের আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগে আবছার উদ্দীনের খামারে মোট ২০টি দুগ্ধবতী গাভী ছিল। প্রতিদিন হাতে দুধ দোহনের কারণে অতিরিক্ত শ্রমিক প্রয়োজন হতো এবং সময়ও বেশি লাগত। এতে খামারের পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি পেত। হাত দিয়ে দুধ দোহনের ফলে গাভীর মধ্যে ম্যাস্টাইটিস রোগের প্রকোপ ছিল মারাত্মক। প্রতি মাসে গড়ে ৮৯টি গাভী ম্যাস্টাইটিসে আক্রান্ত হতো। এর ফলে-

- দুধের উৎপাদন কমে যেত
- দুধের গুণগত মান নষ্ট হতো
- চিকিৎসা ব্যয় বেড়ে যেত
- বাজারে দুধের দাম কম পাওয়া যেত

সব মিলিয়ে খামারটি ধীরে ধীরে লোকসানের দিকে যাচ্ছিল এবং পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ছিল।

প্রকল্প সংযোগ:

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২২ সালে হাবিলাসদ্বীপ ডেইরী প্রডিউসার গ্রুপের যাত্রা শুরু হয়। আবছার উদ্দীন মোঃ রাসেল হাবিলাসদ্বীপ ডেইরী পিজির একজন নিয়মিত সদস্য। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় হাবিলাসদ্বীপ ডেইরী পিজিতে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ হয়েছিল এবং সকল প্রশিক্ষণে আবছার উদ্দীন মোঃ রাসেল অংশগ্রহণ করেছেন। প্রকল্প হতে আবছার উদ্দীন মোঃ রাসেল যে সকল সহায়তা পেয়েছেনঃ

- খামার ব্যবস্থাপনা
- দুগ্ধবতী ও গর্ভবতী গাভী পালন
- নবজাতক বাছুরের যত্ন
- খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও সাইলেন্স প্রস্তুত

- রোগ ব্যবস্থাপনা, কৃমিনাশক ও টিকাদান
- মিক্সিং মেশিন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ
- ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়ন

এই প্রশিক্ষণগুলো খামার পরিচালনায় তার দক্ষতা বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প এলডিডিপি'র আওতায় এমনই এক প্রযুক্তিনির্ভর পরিবর্তনের সফল উদাহরণ হলেন চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নের খামারি আবছার উদ্দীন মোঃ রাসেল।

মিক্সিং মেশিনের মাধ্যমে পরিবর্তন ও ফলাফল:

এলডিডিপি'র আওতায় মিক্সিং মেশিন প্রদান করা হলে হাবিলাসদ্বীপ ডেইরি পিজির পক্ষ থেকে আবছার উদ্দীন মোঃ রাসেল মেশিনটি গ্রহণ করেন। পিজিতে নির্ধারিত চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে তিনি মিক্সিং মেশিন ব্যবহার করে তার খামারে আধুনিক দোহন ব্যবস্থার সূচনা করেন। মিক্সিং মেশিন ব্যবহারের ফলে খামারে যে পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করা যায়-

- অল্প সময়ে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে দুধ দোহন সম্ভব হচ্ছে
- অতিরিক্ত শ্রমিকের প্রয়োজন কমে গেছে
- ম্যাস্টাইটিসের বাঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে
- দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে
- দুধের গুণগত মান স্থিতিশীল হয়েছে

মিক্সিং মেশিন ব্যবহারের মাধ্যমে গাভীর দোহন প্রক্রিয়া আরও আরামদায়ক হওয়ায় গাভীর স্বাস্থ্যও উন্নত হয়েছে। বর্তমানে আবছার উদ্দীন মোঃ রাসেলের খামারে ৫০টি দুগ্ধবতী গাভী রয়েছে। আধুনিক দোহন ব্যবস্থা ও উন্নত খাদ্য ব্যবস্থাপনার ফলে তার খামারের দুধ উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দুধের পাশাপাশি তিনি এখন দই ও ঘি উৎপাদন শুরু করেছেন, যা তার আয় বৃদ্ধিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

ক্র. নং	সূচক/খাত	প্রকল্পের পূর্বে	প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে
০১	গাভীর সংখ্যা	২০টি	৫০টি
০২	দৈনিক দুধ উৎপাদন	২০*৭ = ১৪০ লি.	৪০*১৩ = ৫২০ লি.
০৩	গড় দুধ উৎপাদন(গাভী প্রতি)	৭ লি.	১৩ লি.
০৪	চিকিৎসা খরচ	৬০,০০০/-	২০,০০০/-
০৫	মাসিক শ্রমিক খরচ	১,২০,০০০/-	৮০,০০০/-
০৬	মাসিক নীট আয়	৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/-

আবছার উদ্দীন বলেন, ‘আমি প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের কাছ থেকে কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা পেয়েছি। মিক্সিং মেশিন ব্যবহারের মাধ্যমে

আমার খামারে অল্প সময়ের মধ্যে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে অধিক দুধ দোহন করা সম্ভব হচ্ছে, ম্যাস্টাইটিস প্রতিরোধ করে দুধের উৎপাদন বেড়েছে অনেকগুণ। তাছাড়া প্রকল্পের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নত মানের ঘাস চাষ বিষয়ক পরামর্শ পেয়েছি। ফলে আমি নিজেই সাইলেজ প্রস্তুত করে দুগ্ধবতী গাভীকে খাওয়াতে পারি”।

আবছার উদ্দীনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

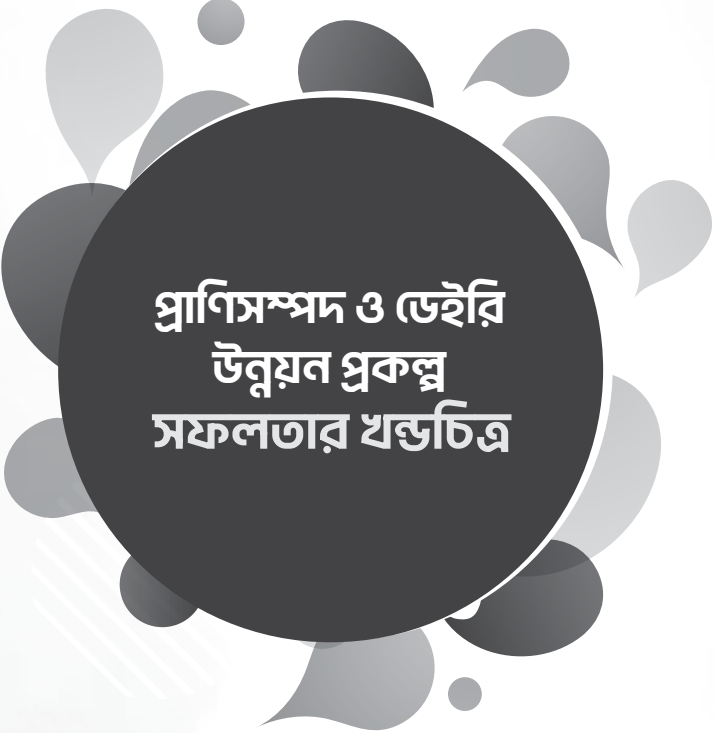
প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রশিক্ষণের আলোকে আবছার উদ্দীন তার খামারকে একটি পূর্ণাঙ্গ ডেইরি উদ্যোক্তায় রূপান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। ভবিষ্যতে তার খামারে দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা ধাপে ধাপে বৃদ্ধি করতে চান। দৈনিক দুধ উৎপাদন ১০০০ লিটারে উন্নীতকরণ করার স্বপ্ন দেখেন পাশাপাশি তার খামার থেকে দই, ঘি, পনির, মাঠা ও মিষ্টি উৎপাদন করে একটি ছোট ডেইরি প্রসেসিং ইউনিট স্থাপন করতে চান।

বাজার ব্যবস্থা সম্প্রসারণ:

আবছার উদ্দীন স্থানীয় বাজারের পাশাপাশি পাইকারি বাজারে সংযোগ করতে চান। নিজ এলাকাকে একটি ডেইরি সমৃদ্ধ অঞ্চলে পরিণত করতে পটিয়া উপজেলায় একটি শক্তিশালী ডেইরি হাব গড়ে তোলার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। বাজার ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করতে পারলে আবছার উদ্দীন শুধু একা নন হাবিলাসদ্বীপ ডেইরি পিজির সকল সদস্য উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আবছার উদ্দীন এখন একজন আদর্শ খামারি:

মিক্সিং মেশিন ব্যবহারের ফলে খামারের উৎপাদন ব্যবস্থা আগের চেয়ে এখন আরও টেকসই। কম সময়ে বেশি দুধ দোহন সম্ভব হওয়ায় খরচ কমেছে এবং লাভ বেড়েছে। গাভীর স্বাস্থ্য ভালো থাকায় দীর্ঘমেয়াদে খামার পরিচালনা সহজ হচ্ছে। তার স্বপ্ন শুধু নিজের খামারে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি চান, পিজির অন্যান্য খামারিদের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করতে। গ্রুপ মিটিং হলে তিনি অন্যান্য সদস্যদের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তিনি বিশ্বাস করেন, প্রযুক্তি ও সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ডেইরি খাত তরুণদের জন্য একটি লাভজনক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র হতে পারে। আবছার উদ্দীন হাবিলাসদ্বীপ ডেইরী পিজিতে মিক্সিং মেশিন ব্যবহার করে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে দুধ দোহন করার মাধ্যমে অন্য খামারিদের জন্য এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আবছার উদ্দীনের সাফল্য প্রমাণ করে যে, সঠিক প্রশিক্ষণ, আধুনিক প্রযুক্তি এবং সমবায়ভিত্তিক উদ্যোগের মাধ্যমে ডেইরি খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব।



প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি
উন্নয়ন প্রকল্প
সফলতার খণ্ডচিত্র



নারী ক্ষমতায়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি



প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে মাঠ দিবস পালন



প্রাণিসম্পদ সেবা কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক



প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে স্কুল মিল্ক কর্মসূচি



প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত আধুনিক কসাইখানা



আধুনিক মানের জেলা কসাইখানায় গরু জবাইকরন



এলডিডিপি কর্তৃক উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে মিনি ডায়াগনস্টিক ল্যাব স্থাপন



এলডিডিপি কর্তৃক জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতালের ডায়াগনস্টিক ল্যাবের আধুনিকায়ন



এলডিডিপি কর্তৃক প্রদত্ত ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট কাউ শেড



এলডিডিপি কর্তৃক প্রদত্ত ডেমো কাউ শেড



এলডিডিপি কর্তৃক নির্মিত আধুনিক মানের ওয়েট মার্কেট



এলডিডিপি প্রকল্পের মাধ্যমে হাইজিনিক এন্ড ক্লিনিং টুল বিতরণ



বিশ্বব্যাংকের টিম কর্তৃক ম্যাচিং গ্রান্টের তানিয়া ভার্মি কম্পোস্ট জৈবসার পরিদর্শন



বিশ্বব্যাংকের টিম কর্তৃক ম্যাচিং গ্রান্টের ভিলেজ মিল্ক ডেইরী
হাব ও ভিএমএমসিসি পরিদর্শন



এলডিডিপি কর্তৃক প্রদত্ত ম্যাচিং গ্রান্টের শেখ দই ঘর ফেরিওয়ালা থেকে ব্যবসায়ী



এলডিডিপি কর্তৃক প্রদত্ত বিনামূল্যে কৃমিনাশক বিতরণ



এলডিডিপি কর্তৃক প্রদত্ত ম্যাচিং থান্টের সিলেট সদর এর দুধওয়ালা



প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সাহায্যপুষ্ট ফিরোজ মিয়ার চিলিং পয়েন্ট



এলডিডিপির সহায়তায় প্রণিসম্পদ উন্নয়নে নারী



আধুনিকতার ছোয়ায় প্রণিসম্পদ এবং নারীর উন্নয়নে এলডিডিপি



এলডিডিপির সহায়তায় প্রণিসম্পদ উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ



এলডিডিপির সহায়তায় ছালমার ভাগ্যোন্নয়নে হাঁস পালন



এলডিডিপি সহায়তায় মনজিলার ভাগ্যোন্নয়নে ভেড়া পালন



এলডিডিপি কর্তৃক প্রদত্ত ম্যাচিং থ্রান্টের ফিড মিল



এলডিডিপি কর্তৃক প্রদত্ত ম্যাচিং গ্রান্টের রাফেজ বেইলিং



এলডিডিপি এর সহায়তায় নির্মিত আধুনিক মানের জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র



ঢাকার সাভারে বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড এর কার্যালয়



ঢাকার সাভারে বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড এর কার্যালয়



এলডিডিপির সহায়তায় আমজাদ হোসেনের ডেইরি উন্নয়ন ও ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প



এলডিডিপির সহায়তায় নিরাপদ পানি ব্যবহারের নিমিত্তে টিউবওয়েল প্রদান



এলডিডিপির সহায়তায় আমেনা বেগমের স্বপ্নপূরণ



এলডিডিপি এর সহায়তায় সাইলেজ প্রস্তুতকরণ

